মুজিবে ভিত্তি
হাসিনায় ব্যাপ্তি

সাফল্যের জোয়ারে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিশ্বের বিস্ময়!!

অক্টোবর ২০১৮

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২টি এডহক এবং ১০টি বিসিএস-এর মাধ্যমে মোট ১৩,৪১৮ জন সহকারী সার্জন এবং ৪২৭ জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

মোহম্মদ নাসিম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য নিয়ে একটি বই প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাস্থ্যখাত প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ৪ বছর আগে, ২০১০ সালে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৮ এর লক্ষ্য অর্জন করেছে। এর স্বীকৃতি হিসেবে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করেছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে গ্রহণ করেছেন। গ্রামীণ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বর্তমান সরকার প্রায় ১৩,৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে; প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে ৭৫ কোটির উপর সেবাগ্রহীতা এসেছে যাদের ৮০% কমিউনিটি ক্লিনিক সেবায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাগ্রহীতার বিশাল সংখ্যা এবং জনসাধারণের সন্তুষ্টি থেকে এর প্রয়োজনীয়তা এবং সফলতা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য জনবলের ঘাটতি অনেকাংশে কমাতে সক্ষম হয়েছে; ২টি এডহক এবং ১০টি বিসিএস-এর মাধ্যমে ১৩,৪১৮ জন সহকারী সার্জন এবং ৪২৭ জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং আরো ১০,০০০ ডাক্তার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশে নার্স ঘাটতি মোকাবেলায় নিয়মিত ভিত্তিতে ৯,৫৯৮ জন এবং এডহক ভিত্তিতে ৪,১০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

নুতন নুতন বিশেষায়িত ও জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস, জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট, কুর্মিটোলা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালসহ অসংখ্য হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০টি হাসপাতাল প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে; ২০১৬ সালে জাতীয় ঔষধ নীতি হালনাগাদ করা হয়েছে। ঔষধ রপ্তানি বিগত বছরগুলোতে দ্রুত হারে বেড়েছে। ঔষধের কাঁচামাল দেশেই উৎপাদনের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ২০০ একর জায়গায় এপিআই পার্ক উদ্বোধন করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বের আদলে দেশে ২১৮টি মডেল ফার্মেসী ও ২১৭টি মডেল মেডিসিন শপ চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। আমি বইটির ব্যাপক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোহম্মদ নাসিম এমপি

“স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩” সার্বক্ষণিক কল সেন্টারের মাধ্যমে সারাদেশ থেকে যে কোন মানুষ যে কোন সময়ে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য জানতে পারছে। ডাক্তারের সাথে কথা বলে স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারছে।

জাহিদ মালেক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতার পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিপুল উন্নয়ন সারা বিশ্বে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে; যার মাধ্যে স্বাস্থ্যখাত অন্যতম। বর্তমান সরকারের হাত ধরে আমরা আজ স্বাস্থ্যবান জাতি হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছি; মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আমরা অর্জন করেছি আন্তর্জাতিক সম্মান, পেয়েছি এমডিজি পুরস্কার, সাউথ সাউথ পুরস্কারসহ বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প বর্তমান সরকারের আমলে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে; বর্তমানে সাড়ে ১৩ হাজারের বেশি, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সারাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও বিগত এক দশকে দেশে ১৩ হাজারের বেশি চিকিৎসক, ১৫ হাজারের বেশি নার্স, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবাদানের মাধ্যমে আমরা, স্বাস্থ্যখাতে সুনাম অর্জন করছি।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন হিসেবে স্বাস্থ্যখাতেও আমরা ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন শুরু করেছি; মাঠকর্মীরা সকল পর্যায়ের কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন উপাত্তসমূহ উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য ভান্ডারে জমা করছে। আমরা দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিমেডিসিন সেবার মাধ্যমে রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা পাওয়ার সুবিধা প্রদান করেছি। এছাড়াও “স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩” সার্বক্ষণিক কল সেন্টারের মাধ্যমে সারাদেশ থেকে যে কোন মানুষ যে কোন সময়ে ‘স্বাস্থ্যসেবা’ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য জানতে পারছে; ডাক্তারের সাথে কথা বলে স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারছে। আমরা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মত স্বাস্থ্যখাতে ই-ফাইলিং সেবা, অনলাইনে বদলী পদায়ন চালু করেছি যা ক্রমশঃ “পেপারলেস” অফিস তৈরির পথে আমাদের এগিয়ে নেবে।

২০১১ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের পর বর্তমান সরকার জাতীয় ঔষধনীতি ২০১৬, মানবদেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন ২০১৮, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন ২০১৮ সহ নানাবিধ আইন প্রণয়ন, জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনের মাধ্যমে দেশে পুষ্টিসেবা জোরদারকরণ, নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস প্রচলনের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ ও উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষায় নুতন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও মেডিকেল কলেজ ও পোস্টগ্রাজুয়েট নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপনসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এদেশের স্বাস্থ্যখাতের এই অসামান্য অর্জনগুলো এই প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের জনমানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। বইটি এ দেশের মানুষের কাছে দেশের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আস্থা স্থাপন এবং স্বাস্থ্যখাতে আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্জনে গর্বিত হবার সুযোগ করে দেবে। প্রকাশনাটির সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

জাহিদ মালেক এমপি

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সাউথ সাউথ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিগত এক দশকে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ক্রমাগত সাফল্য অর্জনের উপর এই প্রকাশনা এক অনন্য উদ্যোগ। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ স্বল্প আয়ের দেশ থেকে উঠে এসেছে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায়। দেশের বিভিন্ন খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাঝে স্বাস্থ্য খাত অন্যতম।

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকারের আমলে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। বর্তমানে ১৩,৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সারাদেশের গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে ৭৫ কোটির উপর সেবাগ্রহীতা ভিজিট করেছে যার ৮০% প্রাপ্ত সেবায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এ ছাড়াও বিগত এক দশকে দেশে ১৩ হাজারের বেশি চিকিৎসক এবং ১৫ হাজারের বেশি নার্স, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবায় আমরা স্বাস্থ্যখাতে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছি। স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটালাইজেশন বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন। 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' নামে একটি সার্বক্ষণিক হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে যেখানে তাৎক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য তথ্য পাওয়া যায়। টেলিমেডিসিন সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য মোবাইল ভয়েস ও এসএমএস ভিত্তিক পরামর্শ এবং ডিএইচআইএস২ সফটওয়ার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহের নেটওর্য়াক তৈরি করা হয়েছে।

এ দেশের স্বাস্থ্যখাতের এই অসামান্য অর্জনগুলো এই প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের জনমানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা সাধারণ মানুষের কাছে দেশের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আস্থা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি এবং এই অদম্য চেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। প্রকাশনাটির সাথে জড়িত সকলকে তাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ সিরাজুল হক খান

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতায় ২০২১ সালের মাঝে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মাঝে উন্নত দেশে পরিণত হবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সুস্থ সবল জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা অগ্রসর হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

বিগত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবায় ধারাবাহিক সাফল্য অর্জনের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এই বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এদেশের মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, এই খাতে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে আমাদের দুর্বার অগ্রযাত্রা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমাদের নানাভাবে গর্বিত করে যার অংশীদার দেশের সাধারণ মানুষ হতে পারবেন এই প্রকাশনাটির মাধ্যমে।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বর্তমান সরকারের হাত ধরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছে, যার মূলে অন্যতম ভূমিকা রেখে চলেছে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের অর্জনগুলো। কেননা সুস্থ জাতিই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। এ সরকারের আমলেই স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং ও স্বাস্থ্য শিক্ষা এই বিষয়গুলো আলাদা এবং আরও জোরদার করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি নুতন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধিতে দক্ষ চিকিৎসা পেশাজীবী সৃষ্টি করতে এবং চিকিৎসক ও নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের অভাব পূরণ করতে বিগত এক দশকে দেশে ৩টি নুতন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৫৩টি নুতন মেডিকেল কলেজ ও ১টি পোস্ট-গ্রাজুয়েট নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। চিকিৎসকদের জন্য উচ্চশিক্ষার আসন বৃদ্ধি, নুতন কোর্স চালুকরণ, নার্সিং বিষয়ে পিএইচডি ও মাস্টার্স কোর্স, বিএসসি নার্সিং এর আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুকরণসহ দক্ষ জনবল তৈরিতে নেয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ।

বিগত এক দশকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং মাঠ পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাথমিক সেবা প্রদানে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। মাঠ পর্যায়ে ১২ হাজারের বেশি নারীকে "স্কিলড বার্থ এটেন্ডেন্ট" হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। মিডওয়াইফ সেবা জোরদার করতে ৩ হাজারের বেশি মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশে ২০০৭ সালে নারী প্রতি গড় সন্তান গ্রহণের হার ছিলো ২.৭ যা বর্তমানে ২.২ এ নেমে এসেছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারী দম্পতি ২০০৭ সালের ৫৬ শতাংশ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৬২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার হাত ধরে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মাঝে উন্নত দেশে পরিণত হবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সুস্থ সবল জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা অগ্রসর হচ্ছে দ্রুতগতিতে। আমাদের সেবার উন্নত মান ও অর্জনগুলোর প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এই প্রকাশনাটি সাধারণ মানুষের কাছে দেশের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আস্থা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। প্রকাশনাটির সাথে জড়িত সকলকে তাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জি এম সালেহ উদ্দিন

জি এম সালেহ উদ্দিন
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত ৫ বছর মেয়াদি ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি ২০১৭-২০২২ এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, এই কর্মসূচিটি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন হলে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি পরিস্থিতির বিরাট উন্নয়ন ঘটবে।

উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে তিন বছর আগেই। আর এ বছর অর্জন করেছে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা ও উৎপাদনক্ষম জনগণ টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সমানতালে এগিয়ে চলছে স্বাস্থ্যখাত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী, দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গত দশ বছরে প্রধান স্বাস্থ্য সূচকসমূহ যথা- শিশুমৃত্যু হ্রাস, মাতৃমৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যার পেছনে রয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনার প্রসার ইত্যাদি কার্যক্রম।

স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিৎ করতে গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ স্থাপন করেছে বর্তমান সরকার। এ ক্লিনিকগুলো দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটালাইজেশনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' নামে একটি সার্বক্ষণিক হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে যেখানে তাৎক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য তথ্য পাওয়া যায়। টেলিমেডিসিন সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য মোবাইল ভয়েস ও এসএমএস ভিত্তিক পরামর্শ এবং ডিএইচআইএস২ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহের নেটওর্য়াক তৈরি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে বর্তমান সরকার দারুণ প্রশংসিত হয়েছে; পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার। নির্দিষ্ট সময়ের আগে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা-৪ অর্জনের অসাধারণ সাফল্যে ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন দেশের জন্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার নিয়ে এসেছে। জাতীয় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত ৫ বছর মেয়াদি ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি ২০১৭-২০২২ এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচিটি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন হলে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি পরিস্থিতির বিরাট উন্নয়ন ঘটবে। ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলো অর্জনের প্রথম ধাপ হিসেবে এই উন্নয়ন কর্মসূচি ভূমিকা রাখবে।

এই বইয়ে বর্তমান সরকারের তিন মেয়াদ এবং বঙ্গবন্ধুর সময়ে স্বাস্থ্যখাতের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও সাফল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বইটি স্বাস্থ্যখাতের সাফল্য যেমন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে তেমনি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যখাতের উত্তরোত্তর উন্নতিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ

অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

সূচনাঃ এ জাতি পারবেই ১
স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর কালোত্তীর্ণ পরিকল্পনা ও জাতীয় স্বাস্থ্যখাতের ভিত্তি রচনা ৩
বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতের বিস্ময়কর এগিয়ে চলার গল্পঃ দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ৫
স্বাস্থ্যসেবা ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা ৭
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরঃ নান্দনিক প্রযুক্তি নির্ভর নুতন স্বাস্থ্য ভবন ৮
- অন্যান্য অধিদপ্তরের নুতন প্রশাসনিক ভবন ৯
- মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ভবন ১০
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল ১১
- স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষায়িত হাসপাতাল ১৪
- মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ এবং হাসপাতাল ৩৪
- মাল্টিডিসিপ্লিনারি হাসপাতাল ৩৬
- জেলা হাসপাতাল ৩৮
- উপজেলা হাসপাতাল ৩৯
- ১০, ২০, ৩১ বা ৫০ শয্যা হাসপাতাল ৪১
- অন্যান্য হাসপাতাল ৪২
- ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৪৩
- কমিউনিটি ক্লিনিকঃ একটি গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ৪৪
- হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ৪৮
- সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী সংখ্যা ৪৯

স্বাস্থ্যসেবায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ৫১
রোগী পরিবহনের জন্য এম্বুলেন্স এবং তদারকির জন্য গাড়িবহর সম্প্রসারণ ৫৫
জরুরী স্বাস্থ্যসেবা সমন্বয় ও অভিযোগ নিদানে নুতন উদ্যোগ ৫৭
চিকিৎসা শিক্ষা ৫৯
স্বাস্থ্য জনবল বৃদ্ধি ও প্রণোদনা ৬৯
জনস্বাস্থ্যে বিস্ময়কর উন্নয়ন ৭৫
- মাতৃস্বাস্থ্য ৭৫
- শিশুস্বাস্থ্য ৭৮
- পুষ্টিসেবা ৭৯
- সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ৮০
- অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি ৮৪
- মানসিক স্বাস্থ্য, অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা ৮৫
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার কর্মসূচি ৮৬

দেশজ ও হোমিও চিকিৎসায় অগ্রগতি ৮৭
স্বাস্থ্যখাতে তথ্য প্রযুক্তির নীরব বিপ্লব ৮৯
চিকিৎসা গবেষণায় অধিকতর মনোযোগ ৯১
ঔষধ শিল্পে স্বর্ণ যুগ ৯৩
আইন ও বিধি-প্রবিধি, নীতি এবং কর্মকৌশল প্রণয়ন ও আধুনিকীকরণ ৯৪
স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি ৯৫
স্বাস্থ্যসেবায় বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় উদ্যোগে ক্রমাগত উৎসাহ দান ৯৬
হতদরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্যসেবাঃ বৃক্ষমানব, মুক্তামনি, ছফুরা-তহুরাদের জন্য মানবতার হাত ৯৭
সমন্বয়, সহায়তা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র ৯৮
জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক স্বাস্থ্যসেবায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ৯৯
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ১০১

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সাফল্য বিশ্বের বিস্ময়!!

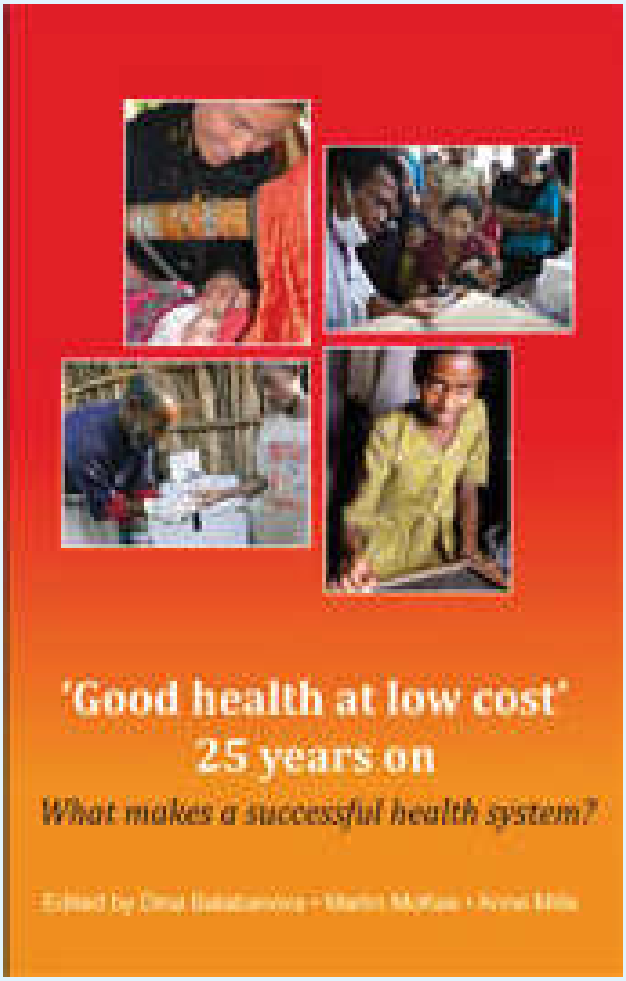

THE LANCET

Series from the Lancet journals | View all Series

Bangladesh: Innovation for Universal Health Coverage

Published: November 22, 2013

Executive Summary

Bangladesh, the eighth most populous country in the world with about 153 million people, has recently been applauded as an exceptional health performer. Improvements in the survival of infants and children under 5 years of age, life expectancy, immunisation coverage, and tuberculosis control in Bangladesh are part of a remarkable success story for health in the South Asian country. This is despite low spending on health care, a weak health system, and widespread poverty. But the nation still faces considerable problems, including deep poverty and malnutrition, and this is being exacerbated by an evolving set of 21st-century challenges. The six-part Series takes a comprehensive look at one of the "great mysteries of global health", investigating a story not only of "unusual success" but also the challenges that lie ahead as Bangladesh moves towards universal health coverage.

Bangladesh: Innovation for Universal Health Coverage
Published: November 22, 2013
Executive Summary
Bangladesh, the eighth most populous country in the world with about 153 million people, has recently been applauded as an exceptional health performer. Improvements in the survival of infants and children under 5 years of age, life expectancy, immunisation coverage, and tuberculosis control in Bangladesh are part of a remarkable success story for health in the South Asian country. This is despite low spending on health care, a weak health system, and widespread poverty. But the nation still faces considerable problems, including deep poverty and malnutrition, and this is being exacerbated by an evolving set of 21st-century challenges. The six-part Series takes a comprehensive look at one of the "great mysteries of global health", investigating a story not only of "unusual success" but also the challenges that lie ahead as Bangladesh moves towards universal health coverage.

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম অনুকরণীয় উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।

এই সাফল্য ও অনুকরণীয় পদক্ষেপ নিয়ে ২০১২ সালে লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিকাল মেডিসিন এবং স্বনামধন্য রকফেলার ফাউন্ডেশন "গুড হেলথ এ্যাট লো কস্ট" নামক বই প্রকাশ করে।

বিশ্বখ্যাত ল্যানসেট চিকিৎসা সাময়িকী বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত নিয়ে ৬টি সিরিজে (ডিসেম্বর ২০১৩) এ দেশের স্বাস্থ্যখাতের সাফল্যকে এশিয়ার বিস্ময় হিসেবে তুলে ধরেছে। নানাবিধ প্রতিকূলতা এবং অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অসাধারণ স্বাস্থ্য সাফল্য এবং এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সাফল্যকে বিশ্ববাসীর কাছে অবিরত তুলে ধরতে প্রয়াত স্বনামধন্য অধ্যাপক হ্যান্স রোজলিং ২০০৭ সালে ইউটিউবে 'মিরাকল বাংলাদেশ' শীর্ষক ভিডিও প্রকাশ করেন যা আজও বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের কাছে প্রদর্শিত।

সূচনা

এ জাতি পারবেই

স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাফল্যের শুরু জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে স্বল্পসংখ্যক নগরবাসীর শহুরে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বিপুল গ্রামীণ জনকেন্দ্রিক পল্লী স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে। স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকারের তালিকায় সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান, গুটি কয়েক জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল থেকে থানায় থানায় শত শত গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, এমবিবিএস-বিডিএস পাশের পরেই ইন্টার্নশীপ ট্রেইনিংকে ইন-সার্ভিস ট্রেইনিংয়ে রূপান্তর করে সে সময় থেকেই নিশ্চিত সরকারি চাকুরী, চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়ে স্বাস্থ্যকে গুরুত্ববহ করে তোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশে এই স্বাস্থ্য অগ্রযাত্রার শুরু।

বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার তিনবারের শাসনামলে সরকার প্রধান হিসাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে অকুণ্ঠ সমর্থন ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তার সার্থক অনুবাদ হয়েছে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র নির্বাচন, যথার্থ পরিকল্পনা, মসৃণ অর্থপ্রবাহ এবং সার্থক বাস্তবায়ন চিকিৎসা শিক্ষা, জনসম্পদ, অবকাঠামো, রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্মূল, তথ্য প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি সাফল্যকে বজ্রনিনাদে ভরিয়ে তুলেছে। সম্প্রতি ভারতের নয়াদিল্লীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিষদের সভায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবায় সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শুধু নিজের ১৬ কোটির অধিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবাতে দেশটি অনন্য তা নয়, সুনামির মত ধেয়ে আশা দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগণকে অতীব প্রতিকূল পরিবেশে যে মানের সেবা দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা দিতে পেরেছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগ, তাও বিশ্বে বিরল বলে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বঞ্চিত দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দু'বারে প্রায় বিশ লক্ষ ডোজ টিকা প্রদানের মধ্য দিয়ে কলেরার মত ভয়াবহ মহামারি থেকে রক্ষা করা এবং হাম-রুবেলাসহ শিশুদের অন্যান্য রোগের টিকাদানের মাধ্যমে সুরক্ষা দান বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গৌরব তিলক 'টিকাদান কর্মসূচির' সক্ষমতাকে বহুলভাবে প্রমাণিত করেছে। এসব কিছুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নির্দেশনার ফসল বলে বোদ্ধামহলে আলোচিত হয়।

দেশে এখন ৪টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ১০০-র উপর মেডিকেল কলেজ, হাজার হাজার হাসপাতাল-ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, কয়েক ডজন উল্লেখযোগ্য অত্যাধুনিক বিশেষায়িত হাসপাতাল, পাঁচ লক্ষাধিক স্বাস্থ্য সেবাদানকারী, রাজধানী ঢাকা থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত জালের মত বিস্তৃত স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে একটি মজবুত ও টেকসই স্বাস্থ্য কাঠামোর উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়েছে। ষোল কোটির অধিক জন অধ্যুষিত এই দেশের যে বিপুল সংখ্যক রোগীকে রাজধানীর বড় হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে শুধু বহির্বিভাগীয় দৈনিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে হয়, তা বিশ্বের অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার সমান বা বেশী। অনুরূপভাবে জরুরী এবং অন্তঃবিভাগে লক্ষ লক্ষ রোগীর সেবা শুশ্রূষা দিয়ে আসছে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ। রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূলে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে গত এক দশকে। উচ্ছেদ (Eradicated) হয়েছে পোলিও, নির্মূল হয়েছে কালাজ্বর, গোদ রোগ এবং ধনুষ্টংকার। নিয়ন্ত্রণ হয়েছে ডায়রিয়া এবং নবোদ্ভুত রোগ চিকুনগুনিয়া।

আমাদের আরও বহুদূর যেতে হবে দেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে মধ্যম আয়ের একটি দেশের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে উন্নত দেশের জন্য স্বাস্থ্য সম্পদে বলীয়ান একটি সক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি করতে।

ইতিমধ্যে পাওয়া অর্জনকে ধরে রাখতে হবে। উদীয়মান অসংক্রামক রোগের চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এ ধাবিত এখন সারা বিশ্ব। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বাংলাদেশও। আমাদের সাথে আছেন অদম্য এবং উচ্চাভিলাসী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ জাতি পারবেই।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর কালোত্তীর্ণ পরিকল্পনা ও জাতীয় স্বাস্থ্যখাতের ভিত্তি রচনা

পাকিস্তানের অবহেলাপুষ্ট স্বাস্থ্য অবকাঠামো যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশে এসে প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছায়। মূলতঃ শহরকেন্দ্রিক সেই অবকাঠামো আপামর মানুষের স্বাস্থ্যসেবা পূরণে আদৌ পর্যাপ্ত ছিল না। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনায় গ্রামকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সৃষ্টি ১০ শয্যার থানা হাসপাতাল ধরে। চিকিৎসা পেশাকে সম্মানজনক পেশায় উন্নীত করার পদক্ষেপ হিসাবে তিনি চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেন। একজন চিকিৎসককে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাব নিয়োগ দেন। সংবিধানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পাওয়াকে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। পাশাপাশি মধ্যম এবং তৃতীয় পর্যায় ও বিশেষায়িত হাসপাতাল তৈরির কার্যক্রম গৃহীত হয় বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। দেশের সকল থানা ও জেলা পর্যায়ে কালক্রমে প্রাথমিক এবং মধ্যম পর্যায়ের হাসপাতাল এবং বিভাগ ও রাজধানীতে তৃতীয় পর্যায় এবং বিশেষায়িত হাসপাতাল গড়ে উঠতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা শিশু হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম), বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি), বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস (বিসিপিএস) এবং বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএমআরসি)। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাকল্পে স্থাপন করা হয় জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), শাহবাগ হোটেলকে পিজি হাসপাতালে রূপান্তরের মাধ্যমে সূচনা করেন উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ যার সার্থক রূপায়ন আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশের বিভাগগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। চারটি বিভাগে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। সে পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তিনি বলেছেন ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে দেশের সকল বিভাগে। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ভিত্তি, দর্শন এবং ভবিষ্যত।

জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে ভিত্তি রচনাঃ বঙ্গবন্ধুর শাসন আমল (১৯৭২-১৯৭৫) সাল

সংবিধানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পাওয়াকে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃতি
চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে মর্যাদা দান
ইন্টার্নশীপকে ইন-সার্ভিসে রূপান্তর
থানায় থানায় গ্রামীণ ১০ শয্যা হাসপাতালসহ স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু
শাহবাগ হোটেলকে পিজি হাসপাতালে রূপান্তর
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান স্থাপন
ঢাকা শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ চালুকরণ
জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) প্রতিষ্ঠা
বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) প্রতিষ্ঠা
বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস (বিসিপিএস) স্থাপন
বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএমআরসি) স্থাপন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
শুভ উদ্বোধন করেন
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৬ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
৩১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
বাস্তবায়নে : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
শেখ রাসেল
শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতের বিস্ময়কর এগিয়ে চলার গল্পঃ দূরদর্শী রাষ্ট্র নায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবা শুরু হয় মূলতঃ প্রাথমিক এবং প্রতিরোধমূলক সেবা দিয়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ছয়টি মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ ও পিজি হাসপাতাল দিয়ে শুরু হয় মধ্যম ও তৃতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্য অর্জন হওয়া এবং জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমান্বয়ে দেশে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্প্রসারিত হতে থাকে মধ্যম পর্যায়, তৃতীয় পর্যায় ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ।
গত চার যুগে বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রায় দুইশত মধ্যম, তৃতীয় এবং বিশেষায়িত পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। জটিল রোগ ব্যবস্থাপনায় দেশে এখন অর্ধশতাধিক তৃতীয় পর্যায় ও বিশেষায়িত হাসপাতাল সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।
এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদান, আধুনিক চিন্তাভাবনা এবং দূরদৃষ্টি। তিনি দেশের আর্থসামাজিক উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত ও বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপনে শুধু সমর্থন দিয়েছেন তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই নিজের উপলব্ধি থেকে এ ধরণের উন্নত হাসপাতাল স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছেন, পরিকল্পনা করেছেন এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। সরকার গঠনের প্রথম মেয়াদে ১৯৯৮ সালেই তিনি তৎকালীন পিজি হাসপাতালকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) রূপান্তর করেন, যা দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্তমানে এটি দেশের চিকিৎসা শিক্ষার পীঠস্থান, শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্র এবং আদর্শ চিকিৎসা গবেষণাকেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী চিন্তা এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়া বিএসএমএমইউ সৃষ্টি এবং তাকে বর্তমান অবস্থায় আনা সম্ভব হতো না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনবারের সরকারে রাজধানী ঢাকা থেকে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে দেশের স্বাস্থ্য অবকাঠামো। অনুকূল পরিবেশে বেসরকারি পর্যায়েও গড়ে উঠেছে সাধারণ ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে শুরু করে উচ্চমানের মধ্যম, তৃতীয় পর্যায় এবং বিশেষায়িত অসংখ্য আধুনিক স্বাস্থ্য স্থাপনা।

বিশ্বমানের জটিল অস্ত্রোপচারসহ প্রতিদিন অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে এসব হাসপাতালে। দেশজুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিশ্বের সাম্প্রতিক সব উদ্ভাবন আর নানান প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগে বাংলাদেশ এখন একেবারেই সম্মুখ সারিতে। বিশ্ব শিখছে তা থেকে। রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, সবখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি যা উন্নত বিশ্বকেও হার মানায়। অত্যাধুনিক সব স্থাপনা, যন্ত্রপাতি এবং সাম্প্রতিক চিকিৎসা সামগ্রীর সমন্বয়ে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার যে আধুনিকায়ন শুরু হয়েছে, তা একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়ে উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখা জাতির স্বাস্থ্য চাহিদার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাফল্য বিশ্বে সৃষ্টি করেছে অপার বিস্ময়। ষোল কোটির অধিক মানুষের চিকিৎসা চাহিদা পূরণ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল, অসংক্রামক রোগসমূহ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধে ব্যাপক উদ্যোগ, পুষ্টি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সূচকসমূহের ব্যাপক অগ্রগতি, স্বাস্থ্য অবকাঠামো খাতে অভূতপূর্ব অর্জন এবং সর্বশেষ দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অপ্রত্যাশিত বিপুল স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ করার সক্ষমতা এখন শুধু বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সাফল্যে জোয়ার নয়, তা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২৮ অক্টোবর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার চানখাঁরপুলে
শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী উদ্বোধন করেন যা বিশ্বের সর্ববৃহৎ

শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী

স্বাস্থ্যসেবা ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা

স্বাস্থ্যসেবায় আধুনিকতা এখন সারাদেশ জুড়ে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিশ্বের সাম্প্রতিক সব উদ্ভাবন আর নানান প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েই চলেছে। এই পরিবর্তন শুধু রাজধানী ঢাকাতেই নয় বরং বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, কমিউনিটি ক্লিনিক ও প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনবারের সরকার রাজধানী থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপকভাবে গড়ে তুলেছেন বিস্তর নুতন নুতন স্বাস্থ্য অবকাঠামোও। ফলে জটিল অপারেশনসহ রোজ অসংখ্য রোগীকে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে এসব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে। এই বইয়ের পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরঃ নান্দনিক প্রযুক্তি নির্ভর নুতন স্বাস্থ্য ভবন

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান ৫টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এই অধিকার বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধীদপ্তর, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালনা করে থাকে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এই অধিদপ্তর। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট বড় মিলিয়ে ছয় শতের উপর সরকারি হাসপাতাল রয়েছে যেগুলোর শয্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। তাছাড়া বর্তমানে সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রস্তাবিত আঠারো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে এ পর্যন্ত সাড়ে তের হাজারের উপর কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে। এসব ক্লিনিক এবং মাঠকর্মীদের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা তথা স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিও নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের চাহিদার আলোকে আরও নুতন নুতন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন, হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ, চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও গবেষণা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এমআইএস, রোগ নিয়ন্ত্রণ, ভাণ্ডার ও সরররাহ, হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা, এমবিডিসি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো শাখাসহ বিভিন্ন অপারেশনাল প্লানসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। এই বিশাল কর্মকান্ড সম্পাদন এবং সমন্বয়ের জন্য সম্প্রতি ২০ তলা স্বাস্থ্য ভবনের ৬ তলা সম্পন্ন হয়েছে মহাখালীর একে খন্দকার সড়কে; প্রযুক্তি নির্ভর এই নান্দনিক ভবনটি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য বিভাগের বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

স্বাস্থ্যভবনের কাজ শেষ হলে ভবনটি কেমন দেখাবে উপরের ছবিটি তারই প্রতিরূপ

অন্যান্য অধিদপ্তরের নুতন প্রশাসনিক ভবন

অন্যান্য অধিদপ্তরের নুতন প্রশাসনিক ভবন ও নুতন স্বাস্থ্যভবন ছাড়াও তৈরি হয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নুতন ভবন। মহাখালীতে অবস্থিত এই ভবনের তিন তলা পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর এখানে অফিস কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখন এটির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও তৈরি হবে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জাতীয় জনসংখ্যা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট)-এর নুতন ভবন। উল্লেখিত নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হবে ২০১৭-২০২২ সালের মধ্যে। এছাড়াও একই মেয়াদে সম্পন্ন হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বেশ কিছু মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ভবন।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নুতন ভবন। ভবনটির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ হবে

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্মীয়মান ভবনের নকশা

নিপোর্টের নির্মীয়মান ভবনের নকশা

প্রশাসনিক ভবন ও কর্মকর্তাদের বাসভবন নির্মাণ প্রকল্পের তালিকা

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০১৪-২০১৮ সাল	নুতন নির্মাণ	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, চট্টগ্রাম	১
২০১৭-২০২২ সাল	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	নুতন স্বাস্থ্য ভবন	১
		ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ভবন	১
		মোট	২
	নুতন নির্মাণ	বিভাগীয় পরিচালক ও উপপরিচালক পরিবার পরিকল্পনার কার্যালয় বরিশাল	১
		উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) কার্যালয়	৩১
		স্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবন; ১টি সার্কেল অফিস ও বিভাগীয় অফিসের সম্প্রসারণ ১টি নুতন সার্কেল ও বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ ও ৩টি বিভাগীয় কার্যালয়	৫
		বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য)-এর কার্যালয়	৩
		সিভিল সার্জন অফিস- ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, যশোর, খুলনা ও রংপুর	৬
		উপজেলা পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা অফিস ও গুদামঘর	১০৪
		সিভিল সার্জনের বাংলো, বগুড়া	১
		মোট	১৫১
		সর্বমোট	১৫৪

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ভবন

সিভিল সার্জন অফিস, নরসিংদী

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল

বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটিই ছিলনা এমন কি এ দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসকগণও এ ধরণের দূরদর্শী চিন্তা করেননি। জাতি জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রথম মেয়াদে সরকার গঠন করে ১৯৯৮ সালে তৎকালীন আইপিজিএমআরকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার প্রস্তাব দেন। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা যেমন রোগীর চিকিৎসা, ভবিষ্যত এবং বর্তমান চিকিৎসকদের উচ্চতর ডিগ্রী, প্রশিক্ষণ এবং সর্বশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা। এমন প্রস্তাবে যুগপৎভাবে উল্লসিত ও রাজী না হওয়ার কোন কারণ ছিলনা দেশ ও চিকিৎসক সমাজের। সকলে মিলে জাতির জনকের স্মৃতি বিজরিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়ে একে দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৯৮ সালের ২২ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রা শুরু করে। ২০০১ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার উৎকর্ষ দেখাতে সক্ষম হয়। কিন্তু, ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন না করায় নানা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। পরম করুনাময়ের অশেষ রহমতে ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা আবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালে তার দল পুনরায় সরকার গঠন করে। তিনি তৃতীয় বারের মত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। এ পর্যায়ে দীর্ঘ এক দশক তার প্রত্যক্ষ আনুকূল্য পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠে। তাই দেশে আরও কিছু নুতন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুক্তি অনিবার্য হয়ে উঠে। এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও তিনটি নুতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এগুলো হলো চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই আইন পাশ হয়েছে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন ও নির্মাণ কাজ শীগগীরই শুরু হবে। সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সর্বশেষ হওয়ায় সেখানকার জন্য উপচার্য মনোনয়ন এবং অন্যান্য কাজ দ্রুতই করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেছেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তার দল বিজয়ী হলে তার চতুর্থ মেয়াদের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে অবশ্যই এই যুগান্তকারী নুতন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৮ সাল)

পটভূমিঃ বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনন্য সংযোজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তদানিন্তন আইপিজিএমআরকে রূপান্তর করে প্রতিষ্ঠিত এটিই দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

আইপিজিএমআর চালু হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ অঙ্গনকে ঘিরে ১৯৬৫ সালে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭২ সালে শাহবাগে অবস্থিত পরিত্যক্ত শাহবাগ হোটেলে এটি স্থানান্তরিত হয়।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ২২ নভেম্বর ১৯৯৮।

পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সন্নিহিত হাসপাতাল ও বহু রোগ নির্ণয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসা প্রদানের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেছে। এর আয়তন ২৪ একর (প্রায়)। ৬টি ব্লক ভবন এবং ৩টি ভবনে বহির্বিভাগ সেবা পরিচালনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া।

ক্রমোন্নয়নের ধারাঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ পরিচালনা কালের তিনটি মেয়াদেই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে একের পর এক বিভিন্ন অত্যাধুনিক সুবিধা চালু হয়। লিভার সিরোসিস ও অস্টিওআর্থ্রাইটিস চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি; হেপাটিক ডায়ালাইসিস;

বৈকালিক বিশেষায়িত বহির্বিভাগ চিকিৎসা সেবা; আধুনিক সিসিইউ; প্রবীণ চিকিৎসা শাখা; ডে-কেয়ার; লিথোট্রিপসি; সর্বাধুনিক ৩৭ শয্যা আইসিইউ ও এইচডিইউ; নবজাতকদের জন্য ৩১ শয্যা অত্যাধুনিক এনআইসিইউ; ১৮ শয্যার পেলিয়েটিভ কেয়ার; মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেল; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি কক্ষ (২৪২); হিমাটোলজি বিশেষায়িত ল্যাব; কৃত্রিম উপায়ে হাঁটু সংযোজন চিকিৎসা সেবা; ২৪/৭ ল্যাব সার্ভিস; ইমিউনো-হিস্টোকেমিস্ট্রি; কক্লিয়ার ইমপ্যান্ট প্রকল্প; সুপার-স্পেশালাইজড হাসপাতাল প্রকল্প; ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা); ন্যাশনাল সেন্টার ফর সার্ভাইকাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এন্ড ট্রেইনিং প্রকল্প ইত্যাদি।

সেবা কার্যক্রমঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শয্যা সংখ্যা প্রায় ২,০০০টি। চিকিৎসা শিক্ষা, রোগ নির্ণয় এবং ক্লিনিক্যাল বিভাগের সংখ্যা ৫২টি। প্রতিষ্ঠানটিতে দৈনিক রোগীর গড় সংখ্যা নিম্নরূপঃ বহির্বিভাগ (সকাল): ৯,২৩৭; বহির্বিভাগ (বিকাল): ৭২৩; অন্তঃবিভাগ (নুতন ভর্তি): ১০৮; জরুরী বিভাগ: ৩৬ থেকে ৪০ জন এবং অস্ত্রোপচার: ১৬৮টি। বৈকালিক বহির্বিভাগ চালু হয় ২০১১ সালের অক্টোবরে।

জনবলের পদ সংখ্যাঃ মোট চিকিৎসক ১১৭১জন; শিক্ষকঃ ৫০৭ জন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকঃ ১০৪ জন; মেডিকেল অফিসার ৫৬০ জন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৬ সাল)

পটভূমিঃ বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানে নুতন সংযোজন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (চমেবি)। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের নির্বাচনী তফসিলে প্রতি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষনা দেন। সেই অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রকল্প গৃহিত হয় এবং "চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৬" সংসদে পাস হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। অত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইসমাইল খান ২০১৭ সালের মে মাস থেকে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১২ মে ২০১৬।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা

পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষার প্রসার, গবেষণা ও দক্ষ স্বাস্থ্য সেবাদানকারী তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ১৬টি মেডিকেল কলেজ, ২টি ডেন্টাল কলেজ, ৪টি নার্সিং কলেজ অত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভূক্ত রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সেশন থেকে ভর্তি শিক্ষার্থীরা এখন অত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিবন্ধিত হচ্ছে। বৃহত্তর চট্টগ্রামের সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত থাকবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ফৌজদারহাটে ২৪ একর জমি বরাদ্দ করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৬ সাল)

পটভূমিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে "রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৬" সংসদে পাস হয় এবং এর মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে অধ্যাপক ডাঃ মাসুম হাবিব গত ৩০ জুন ২০১৮ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১২ মে ২০১৬।

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসের জন্য
রাজশাহী নগরীর বড়বনগ্রাম মৌজায় নির্বাচিত জমির একাংশ

পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষার প্রসার, গবেষণা ও দক্ষ স্বাস্থ্য সেবক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ২৩টি মেডিকেল কলেজ, ৭টি ডেন্টাল কলেজ, ১৬টি নার্সিং কলেজ, ১টি ইউনানী কলেজ, ২টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি অত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীস্থ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে অস্থায়ী কার্যালয় হিসাবে চলছে। ২০১৭-২০১৮ সেশন থেকে ভর্তি শিক্ষার্থীরা এখন অত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিবন্ধিত হচ্ছে। বৃহত্তর রাজশাহীর সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বড় বনগ্রাম এলাকায় ৮৫.৮০ একর জমি বরাদ্দ করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। গত ২৬ মে ২০১৮ প্রথম ও ০১ জুলাই ২০১৮ দ্বিতীয় সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাইনের কাজ এগিয়ে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি অন্তর্ভুক্ত সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রমের নিয়মিত তত্ত্বাবধায়ন করছে।

সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৮ সাল)

পটভূমিঃ বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা বিজ্ঞানে নুতন সংযোজন সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সিএমইউ)। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের নির্বাচনী তফসিলে প্রতি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষনা দেন। সেই অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে সিলেটে এক জনসভায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষনা দেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ৪র্থ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সংসদে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়।

পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষার প্রসার, গবেষণা ও দক্ষ স্বাস্থ্য সেবক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে। এজন্য বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আরও অন্য সব বিভাগের প্রতিটিতে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষায়িত হাসপাতাল

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৮টি স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংযুক্ত বিশেষায়িত হাসপাতাল রয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও বিশেষায়িত হাসপাতাল, প্রশিক্ষণ, জনস্বাস্থ্য এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৮টিই বঙ্গবন্ধু বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে নির্মিত ও নির্মিয়মান। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই বিপুল উন্নয়ন ঘটেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে।

বঙ্গবন্ধুর আমলে (৭টি)

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড হসপিটাল (জাতীয় পঙ্গু পুনর্বাসন ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল) (১৯৭২ সাল)
- বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস (বিসিপিএস) (১৯৭২ সাল)
- বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) (১৯৭৩ সাল)
- বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) (১৯৭২ সাল)
- ঢাকা শিশু হাসপাতাল (১৯৭২ সাল)
- জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) (১৯৭৪ সাল)
- ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন (আইপিএইচএন) (১৯৭৪ সাল)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে (১১টি) ১৯৯৬-২০০১ সাল (১টি)

- শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা (১৯৯৮ সাল)
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি (২০০১ সাল)

২০০৯-২০১৩ সাল (৫টি)

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল (২০১২ সাল)
- জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (২০১৩ সাল)
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) এন্ড হসপিটাল, চট্টগ্রাম (২০১৩ সাল)
- শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট (২০১৩ সাল)

২০১৪-২০১৮ সাল (৫টি)

- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ (২০১৫ সাল)
- ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা), বিএসএমএমইউ (২০১৫ সাল)
- শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী এন্ড হসপিটাল (২০১৮ সাল)
- শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল (২০১৮ সাল)
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন (২০১৮ সাল)

স্বাধীনতা পূর্বকালে (২টি)

- ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ (আইপিএইচ) (১৯৫৩ সাল)
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজিজেস অব দ্যা চেস্ট এন্ড হসপিটাল (১৯৫৫ সাল)

স্বাধীনতা পরবর্তী অন্যান্য সকল সরকারের আমলে (১৯৭৭-১৯৯২ সাল) (৮টি)

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেইনিং (১৯৭৭ সাল)
- ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ (১৯৭৬ সাল)
- জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (১৯৭৮ সাল)
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অফথ্যালমোলজি এন্ড হসপিটাল (১৯৭৯ সাল)
- ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ (১৯৮১ সাল)
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ এন্ড হসপিটাল (১৯৮২ সাল)
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (১৯৮৮ সাল)
- ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রিভেশন অব রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ (১৯৮৮ সাল)

বাংলাদেশের স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা

সরকার	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
স্বাধীনতা পূর্বকাল	১৯৪৬-১৯৭১ সাল	২
বঙ্গবন্ধুর সরকার	১৯৭২-১৯৭৫ সাল	৭
শেখ হাসিনার সরকার	১৯৯৬-২০০১ সাল	২
	২০০৯-২০১৩ সাল	৪
	২০১৪-২০১৮ সাল	৫
	মোট	১১
মোট আওয়ামী লীগ সরকার		১৮
অন্য সরকার	১৯৭৬-১৯৯৫ সাল	৮
	২০০২-২০০৮ সাল	০
	মোট	৮
সর্বমোট		২৮

ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ (আইপিএইচ) (১৯৫৩ সাল)

পটভূমিঃ ১৯৫২ সালে সংযুক্ত জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিতে ছিল জনস্বাস্থ্য এবং পানি, অণুজীব, কেন্দ্রীয় ঔষধ গবেষণাগার এবং পুষ্টি ও টিকা উৎপাদন ইউনিট। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর নামকরণ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এটি একটি অন্যতম পুরনো এবং বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। মহাখালী ঢাকায় এটি ৪৭.৮০ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত।

উদ্দেশ্যঃ জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রেফারেল সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষ্যঃ টিকা উৎপাদন, খাদ্য সুরক্ষা ও মান উন্নয়ন, পোলিও, হাম, রুবেলা ইত্যাদি রোগ নির্ণয়ে, জনস্বাস্থ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স পরিচালনা এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ অধিভুক্ত সংস্থার সাথে সমন্বয় প্রভৃতি।

ন্যাশনাল পোলিও এবং হাম গবেষণাগারঃ আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এবং ডব্লিউএইচও সমর্থিত গবেষণাগার। জাতীয় রেফারেল গবেষণাগার হিসেবে কাজ করে থাকে।

এইচআইভি/এইডস গবেষণাগারঃ এইচআইভি/এইডস এর স্ক্রিনিং এবং কনফারমেটরি পরীক্ষা।

ব্যাক্টেরিওলজি ইউনিটঃ এই ইউনিটের কার্যক্রমের মাঝে অন্তর্গত আছে জাতীয়ভাবে ছোঁয়াচে রোগের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ।

এপিডেমিওলজি ইউনিটঃ এই ইউনিটের কার্যক্রমের মাঝে অন্তর্গত আছে জাতীয়ভাবে সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ।

বায়োলজিক্যালস উৎপাদনঃ ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড, কন্টিনিউয়াস এম্বুলেটরি পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস ফ্লুইড ও রক্তের ব্যাগ, ডায়াগনস্টিক রিএজেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র।

মান নিয়ন্ত্রণ গবেষনাগারঃ খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা গবেষণাগার, জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার, খাদ্য নিরাপত্তা কেন্দ্র।

একাডেমিক উইংঃ স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে স্নাতক (গবেষণাগার খাদ্য নিরাপত্তা), স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে স্নাতক (খাদ্য নিরাপত্তা), জনস্বাস্থ্যে মাস্টার্স (খাদ্য নিরাপত্তা) কোর্স পরিচালনা।

প্রশাসনিক উইংঃ গবেষণা এবং প্রকাশনা, তথ্য প্রযুক্তি এবং জনসম্পর্ক উইং পাঠাগার, অন্যান্য সংস্থাকে সহযোগিতা।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজিজেস অব দ্যা চেস্ট এন্ড হসপিটাল (১৯৫৫ সাল)

১৯৫৫ সালে ২০০ শয্যার এই হাসপাতালটি ঢাকার মহাখালীতে ৪৭ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই দেশের একমাত্র হাসপাতাল যেখানে জটিল বক্ষব্যাধি রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। এ ছাড়া যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয়। ১০টি ভিন্ন ব্লকে ৬৮৫টি শয্যা রয়েছে।

শয্যা বিভাজনঃ বক্ষব্যাধিঃ ১৭০; পালমোনারি টিবিঃ ৩৩০; হাঁপানী রোগীঃ ৮৫; এমডিআর টিবিঃ ৭০; পেয়িং শয্যাঃ ১০০; রেসপিরেটরি ইউনিটঃ ১০ এবং থোরাসিক সার্জারীঃ ৭।

চিকিৎসকের পদ ১১৬টি। অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ ৩৮২টি।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (১৯৭২ সাল)

পটভূমিঃ স্বাধীনতা যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরাসরি উদ্যোগে বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন আর জে গার্স্ট-এর সহায়তায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ১৯৭২ সালের জুন মাসে পঙ্গু ও পুনর্বাসন হাসপাতাল নামে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনায় হাড়ে আঘাত পাওয়া; অস্থি ও অস্থিসন্ধি রোগের চিকিৎসা এবং পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি চালু হয়।

প্রতিষ্ঠাঃ ২০০২ সালে এর নুতন নামকরণ করা হয় ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যতম নজির শের-ই-বাংলা নগরে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি।

কার্যক্রমঃ ১৯৭৩ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে মাস্টার্স অব সার্জারী কোর্স চালু হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে ডিপ্লোমা ইন অর্থোপেডিক সার্জারী কোর্স চালু হয়।

জনবল ও সম্প্রসারণঃ বর্তমানে চিকিৎসক সংখ্যা ১৯২ এবং অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ৫০০। ১৯৭৩ সালে শয্যা ছিল ২৫০টি। আরও ১,০০০ শয্যা বৃদ্ধির জন্য নুতন ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর নুতন ভবনটি উদ্বোধন করেন।

ঢাকা শিশু হাসপাতাল (১৯৭২ সাল)

পটভূমিঃ মার্চ, ১৯৭২ সালে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন হয় ঢাকার ধানমন্ডিতে। ১৯৭৪ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)'র সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শিশু হাসপাতালের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। হাসপাতালটি ১৯৭৫ সালে শের-ই-বাংলা নগরে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ জানুয়ারি ২০১২ সালে একটি ৯ তলা ভবন বিশিষ্ট নুতন হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সেবা কার্যক্রমঃ ঢাকা শিশু হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জারী, কার্ডিয়াক সার্জারী ও এনেস্থেসিয়া বিভাগের সাথে ডায়াগনস্টিক এবং এপিডেমিওলজি ও গবেষণা বিভাগ চালু আছে। হাসপাতালটিতে পেডিয়াট্রিক আইসিইউ, পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক আইসিইউ, নিউনেটাল আইসিইউ, এইচডি এন্ড আইসোলেশন ইউনিট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, নেফ্রোলজি এন্ড ডায়ালাইসিস এবং থ্যালাসেমিয়া সেন্টারের মত বিশেষায়িত সেবা বিভাগ রয়েছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও জরুরী বিভাগে প্রতিদিন ১৫-২০% রোগীর চিকিৎসা এবং ৩৬% শয্যা বিনামূল্যে গরিব রোগীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানে ১৯৮৩ সালে স্নাতকোত্তর কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকা শিশু হাসপাতালের একাডেমিক উইং এর নাম বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ (বিআইসিএইচ)।

ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল (১৯৮১ সাল)

পটভূমিঃ ১৯৮১ সালে প্রথম এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হাসপাতালটির জন্য ১২.৬২ একর জমি বরাদ্দ করে। ১৯৯১ সালে একনেক এই প্রকল্পটি অনুমোদন করে। ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতে বিশেষ উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আইসিএমএইচের প্রতিষ্ঠা।

পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে ১টি হাসপাতাল ভবন; ১টি প্রশাসানিক ভবন; ১টি অডিটোরিয়াম ও ৪টি প্রশিক্ষণ কক্ষ বিশিষ্ট ১টি প্রশিক্ষণ ভবন রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থী, চিকিৎসক, স্টাফ ও নার্সদের জন্য আবাসিক ভবন, ১টি ব্যাংক ও ১টি মসজিদ রয়েছে। একাডেমিক বিভাগসমূহের মধ্যে পেডিয়াট্রিক্স, অবসটেট্রিক্স এন্ড গাইনোকলজি, এপিডেমিওলজি, এনেস্থেসিয়া, ল্যাবরেটরি মেডিসিনসহ নুতন করে যুক্ত হয়েছে স্ক্যানু এন্ড এনআইসিইউ ও মিডওয়াইফারি স্কুল, ক্যাঙ্গারু মাদারকেয়ার সার্ভিস ও স্যাম ইউনিট। বর্তমানে এই হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট অন্তঃবিভাগ, ২৫ শয্যার এনআইসিইউ ও বহির্বিভাগ রয়েছে। ১৯৯৯-২০১৭ পর্যন্ত বহির্বিভাগ ও জরুরী বিভাগে মোট ২২,৪২,০৩১ জন রোগী চিকিৎসা পেয়েছে। ১,০৭,২২২ জন রোগী ভর্তি হয়েছে, স্বাভাবিক জন্ম হয়েছে ২৬,৮৪৪টি শিশুর এবং ৬৯,৭২১টি শিশুর সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে জন্ম হয়েছে। ৪০ শয্যা বিশিষ্ট স্ক্যানু বিভাগে এপর্যন্ত ৩,২৪৩ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে ডিসিএইচ, এমডি, ডিজিও, এমএস এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স অন আর্লি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স চালু রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ২০৬টি গবেষণা, ১৭১টি জাতীয় ও ২১টি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ২টি বৈজ্ঞানিক জার্নাল প্রকাশ করে আসছে। বিভিন্ন ধরনের দাতা ও বেসরকারি সংস্থা যেমন জাইকা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, সেভ দ্যা চিলড্রেন ইত্যাদি আইসিএমএইচের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (১৯৭৩ সাল)

পটভূমিঃ বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিল আইন ১৯৭৩-র অধীনে প্রথম বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিল গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে উক্ত আইন রহিত করে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ১৯৮০ পাস হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০ (৬১ নং আইন) পাস হয়। রেজিস্ট্রার এর নেতৃত্বে এই পরিষদ এর একটি কার্যালয় আছে যেটি ২০৩ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী ঢাকাতে অবস্থিত। এই পরিষদের প্রধান নির্বাহী হল রেজিস্ট্রার। যার দায়িত্ব হলো সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কয়েকটি পরিষদ নিয়ে গঠিত। পরিষদে আছে নিম্নোক্ত কমিটি যারা বিভিন্ন ধরণের কাজ করে থাকে।

নির্বাহী কমিটিঃ নির্বাহী কমিটি গঠিত হয় প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পাঁচ জন সদস্য নিয়ে। এই কমিটি প্রশাসন, আর্থিক এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়।

স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটিঃ এই কমিটি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এই কমিটির কাজ হলোঃ

- মেডিকেল এবং ডেন্টাল বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর যোগ্যতা অর্জনের জন্য অভিন্ন ন্যূনতম প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করা।
- শিক্ষাক্রমের জন্য ন্যূনতম সময়কাল সুপারিশ করা।
- প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের ভর্তি শর্তাদি সুপারিশ করা।
- মেডিকেল এবং ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগে ন্যূনতম যোগ্যতার সুপারিশ করা।
- মেডিকেল এবং ডেন্টাল বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরীক্ষার মান, পরীক্ষা পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের জন্য

সুপারিশ করা।

- মেডিকেল এবং ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষার পরীক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার মানদন্ড সুপারিশ করা।

শৃঙ্খলা কমিটিঃ এই কমিটি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা নির্বাচিত হন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে। এই কমিটি বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে বাদী ও বিবাদীর শুনানির মাধ্যমে বিভিন্ন আইনগত ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস (বিসিপিএস) (১৯৭২ সাল)

মেডিকেল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন এবং প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস বাংলাদেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এটির নাম ছিল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস অব পাকিস্তান। অফিস ছিলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। যুদ্ধের পর জুন ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে এটি বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস নামে কাজ শুরু করে। কলেজ পরিষদ গঠিত হয় ২০ জন উপদেষ্টা নিয়ে। এর মধ্যে ১৬ জন নির্বাচিত হন এবং বাকি ৪ জন মনোনীত হন সরকার কর্তৃক।

অবস্থানঃ মহাখালী, ঢাকা।

একাডেমিক কার্যক্রম চলে ১৪টি অনুষদের মাধ্যমে। বর্তমানে ৩টি ভবনে কার্যক্রম চলে।

পুরাতন ভবনঃ এটি ব্লক "এ" নামে পরিচিত। এতে রয়েছে ৩টি তলা।

নিচ তলাঃ এতে রয়েছে সুসজ্জিত লবি, প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্টের কক্ষ, আলোচনা কক্ষ, পরীক্ষা কক্ষ এবং সাধারণ স্টোর।

২য় তলাঃ নামাজ কক্ষ, অডিটোরিয়াম, মেডিকেল এডুকেশন বিভাগ, পুরাতন পরিষদ কক্ষ, বহুমুখী শ্রেণীকক্ষ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অফিস।

৩য় তলাঃ ২টি পরীক্ষার কক্ষ।

একাডেমিক ভবনঃ এটি ব্লক "বি" নামে পরিচিত। এতে রয়েছে পরিষদ কক্ষ, পরীক্ষা কক্ষ, শ্রেণী কক্ষ, ডিজিটাল জাদুঘর, পাঠাগার, আর্কাইভ, মুদ্রণ এবং প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ।

নুতন ভবনঃ এটি ব্লক "সি" নামে পরিচিত। এতে রয়েছে লবি, রিসিপশন ডেস্ক, প্রশাসন বিভাগ, সচিবালয়, কোষাধ্যক্ষ অফিস, অর্থনীতি বিভাগ, পরীক্ষা কক্ষ এবং বহুমুখী শ্রেণী কক্ষ। কলেজ লাইব্রেরিতে সাম্প্রতিক বইসহ সাময়িকীপত্র এবং ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। এখানে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী একত্রে বসে পড়ার সুযোগ পায়।

দুইটি আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া আছে। একটি পরীক্ষার্থীদের এবং অন্যটি ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মচারীদের জন্য।

কার্যক্রমঃ এফসিপিএস প্রথম পর্ব পরীক্ষার্থীদের মৌলিক বিষয়ের উপর সাপ্তাহিক কোর্স করানো হয় বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জানুয়ারি, জুন, জুলাই এবং ডিসেম্বর মাস ব্যতীত সারা বছর ধরে।

অব্যাহত পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমঃ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কার্যক্রম চলছে। সেই সাথে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মশালা, সেমিনার এবং আলোচনা চলে।

বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) (১৯৭২ সাল)

প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৭২ সালে।

অবস্থানঃ মহাখালী, ঢাকা।

পটভূমিঃ এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তৎকালীন রাষ্ট্রপতির আদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের নীতি অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য গবেষণার জন্য কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য সংস্থা, অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর মধ্যে রয়েছে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি, স্বাস্থ্য গবেষণা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয়।

উদ্দেশ্যঃ স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা ও স্বাস্থ্যে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করা।

লক্ষ্যঃ স্বাস্থ্যে গবেষণার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে দক্ষ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

কার্যক্রমঃ পরিষদের প্রধান কার্যক্রম হলো স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার কাজগুলোকে সংগঠিত এবং এর উন্নয়ন করা, গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষ লোকবল তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া, গবেষণার ফলাফলগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা।

বছরে তিনবার বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল বুলেটিন প্রকাশ করে। যার মধ্যে গবেষণার কাজগুলোকে প্রকাশ করা হয়। যে কোন মৌলিক গবেষণার জন্য ইথিক্যাল ছাড়পত্র দেয়ার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিএমআরসি।

জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) (১৯৭৪ সাল)

প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৭৪ সালে।

অবস্থানঃ মহাখালী, ঢাকা।

পটভূমিঃ জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)'র পথচলা শুরু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাত ধরে ১৯৭৪ সালে। শিক্ষা কার্যক্রমের যাত্রা ১৯৭৮ সাল থেকে। পাবলিক হেলথ বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটি। পাশাপাশি বাংলাদেশের সরকারি পর্যায়ে 'পাবলিক হেলথ' সেক্টরে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, যা এই সেক্টরে দেশের জনবল বৃদ্ধিতে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠানও বটে। ২০০৬ সাল থেকে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র সহযোগী কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এছাড়াও ১৯৯০ সাল থেকে ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুল অব পাবলিক হেলথ এবং এশিয়া প্যাসিফিক একাডেমিক কনসোর্টিয়াম ফর পাবলিক হেলথ (এপিএসিপিএইচ) এবং ২০০৪ সাল থেকে সাউথ-ইস্ট এশিয়ান পাবলিক হেলথ এডুকেশন ইনস্টিটিউট নেটওয়ার্ক (এসইএপিএইচইআইএন) এর সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানটি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত।

রূপকল্পঃ চিকিৎসা শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও জীবন মানের উন্নতি সাধন করা।

পাবলিক হেলথ সেক্টরের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং পরামর্শ দান এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপরিধি। চিকিৎসকদের ৬৩টি সহ অন্যান্য পদ মিলিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে মোট ১৯৩টি পদ রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আছে ১২টি বিভাগ এগুলো হলো বায়োস্ট্যাটিস্টিকস, কমিউনিটি মেডিসিন, এন্টোমোলজি, এপিডেমিওলজি, হেলথ এডুকেশন, ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ, মাইক্রোবায়োলজি, নিউট্রিশন এন্ড বায়োকেমিস্ট্রি, অকুপেশনাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, প্যারাসাইটোলজি, পপুলেশন ডায়নামিকস, পাবলিক হেলথ এন্ড হসপিটাল এডমিনিস্ট্রেশন। এ সব বিভাগের মাধ্যমে এমপিএইচ ও এমফিল কোর্স পরিচালিত হয়।

ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন (আইপিএইচএন) (১৯৭৪ সাল)

প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৭৪ সালে।
অবস্থানঃ মহাখালী, ঢাকা।

জাতির জনক ১৯৭৪ সালে 'জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল 'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ' গঠনের আদেশ স্বাক্ষর করেন। দেশে প্রথম বৃহৎ পরিসরে পুষ্টি প্রকল্প 'বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প' শুরু হয় ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে। জনগণের দোরগোড়ায় পুষ্টিসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং পুষ্টিমানের উন্নতি সাধন করে ভিশন ২০২১ রূপকল্প অর্জনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সাল তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) অধীনে (২০১১-২০১৬) মূলস্রোত ধারায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী সকল উপজেলায় জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিতে (২০১৭-২০২২ সাল) এনএনএস কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান প্রতিষ্ঠান আইপিএইচএন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি (২০০১ সাল)

প্রতিষ্ঠাঃ ২০০১ সালে।
অবস্থানঃ শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ এপ্রিল ২০০১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে কিডনী রোগের চিকিৎসায় বিশ্বমানের নুতন যুগের সূচনা করেছে। ৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটিতে চিকিৎসকের সংখ্যা ৬৪ জন। স্টাফ সংখ্যা ৪৬২ জন। অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ১৫০টি। তবে শয্যা সংখ্যা ৪০০-তে উন্নীত করার প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ভারতের একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ডায়ালাইসিস সেবা চালু আছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল (২০১২ সাল)

পটভূমিঃ ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল উদ্বোধন করেন। সাধারণ জনগণের কাছে বিশ্বমানের স্নায়ুরোগ চিকিৎসা স্বল্প খরচে প্রদান করছে ৩৫০ শয্যা এই হাসপাতালটি। হাসপাতালটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ তলা বিশিষ্ট নুতন ভবন তৈরির কাজ চলমান। স্ট্রোক ক্লিনিক, ইপিলেপসি ক্লিনিক, ডে ক্লিনিক, মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার ক্লিনিক ইত্যাদির মাধ্যমে এই হাসপাতালে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে।

সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াধীনঃ ১২ তলা বিশিষ্ট নুতন ভবন তৈরির কাজ।

সম্প্রসারণ ব্যয়ঃ ৪২০ কোটি টাকা।

২০১৭ সালে মেজর সার্জারীর সংখ্যাঃ ১,৪৮৯ এবং মাইনর সার্জারীর সংখ্যা ৮৬ ।

রোগী সেবা প্রাপ্তিঃ ২০১৭ সালে বহির্বিভাগে ২৪০,৭৬৪ জন; অন্তঃবিভাগে ১০,৮৭১ জন এবং জরুরী বিভাগে ২৬,৯৫০ জন।

জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (২০১৩ সাল)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ উদ্যোগে ২০১৩ ঢাকার তেজগাঁওয়ে ১০০ শয্যার এই অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়। ঐ বছর ১৯ জুন থেকে সেবা প্রদান চালু হয়। এখানে অত্যাধুনিক অডিও-ভেস্টিবুলার ল্যাব, স্পিচ স্টাডি, স্কিল ল্যাব ও ইএনটি ওয়ার্ক স্টেশনসহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ মোট চিকিৎসক সংখ্যা ৯১ জন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৯০,৮৩৩ রোগীকে বহির্বিভাগীয় এবং ৫,২২৮ রোগীকে জরুরী বিভাগীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,৪৮৯টি মেজর অস্ত্রোপচারসহ মোট ১,৭০২টি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। চালুর পর মোট অস্ত্রোপচার হয়েছে ১২,০০০-এর বেশী। ৬.৫ একর জমির উপর ৮ তলা বিশিষ্ট ভবন নিয়ে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে শয্যা সংখ্যা ২৫০টি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৫০ জন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) এন্ড হসপিটাল (২০১৩ সাল)

পটভূমিঃ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজিকে সামনে রেখে এবং ট্রপিকাল ও সংক্রামক রোগসমূহ মোকাবেলার গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান সরকার বিগত ২০০৯ সালে রাজধানী ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম ফৌজদারহাটে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) স্থাপন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্দেশ্যঃ

- একটি বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও সংক্রামক রোগসমূহের আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করা।
- স্নাতকোত্তর কোর্স ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা।
- গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও সংক্রামক রোগসমূহের উপর নিবিড় গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।
- রোগ নির্ণয়ে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের ল্যাবরেটরি স্থাপন করে জনগণকে স্বল্প খরচে নির্ভুল ও উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনঃ ৩০০ শয্যার হাসপাতালসহ বিআইটিআইডি ফৌজদারহাটে প্রায় ১.৭৫ একর জায়গার উপর অবস্থিত।
জনবলঃ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১ ডিসেম্বর ২০১০ সালে মোট ২০৭টি পদ সৃজন করা হয় এর মধ্যে ৫৪টি পদ স্থায়ী ১০০টি অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে এবং বাকি ৫৩টি পদ আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে।
জনবলঃ সৃষ্ট পদসমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তার জন্য ৭৫টি, দ্বিতীয় শ্রেণী ৪৬টি, তৃতীয় শ্রেণী ৩০টি ও চতুর্থ শ্রেণী ৩টি।
হাসপাতালের কার্যক্রমঃ ২০১৭ সালে বহির্বিভাগে ৩৪,৫৩১ জন, অন্তঃবিভাগে ৬,৬৮৭ জন এবং জরুরী বিভাগ ৬৯,৩২ জন রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এর মধ্যে মোট ১,৮৬৩ জন প্রাণীর কামড়ের রোগী ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে বায়োসেফটি লেভেল-২ ও লেভেল-৩ ল্যাব চালু আছে।

শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট (২০১৩ সাল)

আন্তর্জাতিক মানের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে গাজীপুরে প্রথম উদ্বোধন হয় শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট। মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠান কেপিজে এবং বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই হাসপাতালটির প্রথম বহির্বিভাগ চালু হয় ২০১৪ সালের এপ্রিলে।
প্রতিষ্ঠাকালঃ ২০১৩ সাল।
পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ ২৫০ বেডের ৮ তলা এই হাসপাতালটি প্রায় ৬.৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটটি বাংলাদেশে প্রথম আইএমএস স্বীকৃত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ। এই ইনস্টিটিউটে ৪ বছরের বেসিক বিএসসি এবং ২ বছরের পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু আছে।
জনবলের পদ সংখ্যাঃ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ সর্বমোট ৫০ জন চিকিৎসক।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (২০১৫ সাল)

পটভূমি ঃ অন্যান্য সরকারগুলোর আমলে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলোকে দীর্ঘকাল উন্নয়ন বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও অবহেলিত ছিল এলাকার জনগণ। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৫ সালে জাতির জনকের শহীদ সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের নামে গোপালগঞ্জে আন্তর্জাতিক মানের চক্ষু চিকিৎসা সেবাদানের নিমিত্তে প্রায় ১৫ একর এলাকা জুড়ে ২১টি ভবন নিয়ে গড়ে ওঠে এই আধুনিক প্রতিষ্ঠানটি। সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে বসবাসকারী মানুষ বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা পাচ্ছে এই হাসপাতাল থেকে।

প্রতিষ্ঠাঃ কার্যক্রম শুরু হয় ২৯ আগস্ট ২০১৫ সালে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালের ৩০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

সেবাদানকারীঃ সেবা প্রদানের জন্য এখানে নিয়োজিত আছে ৪০ জন চিকিৎসক (মঞ্জুরীকৃত পদ ৯১টি), ১৬২ জন নার্স (মঞ্জুরীকৃত পদ ২০০টি) ও অন্যান্য জনবল ২৮৩ জন।

সেবা কার্যক্রমঃ এখানে রেটিনা, গ্লুকোমা, কর্ণিয়া, শিশু চক্ষু রোগ, ছানি অপারেশন, চোখের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষাসহ চোখের প্রায় সব ধরণের চিকিৎসা করা হয়। ১০০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালে রয়েছে ৯টি অপারেশন থিয়েটার, ২টি পোস্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ড, ডে-কেয়ার সুবিধা, ল্যাবরেটরি সুবিধা, রোগী পরিবহনের জন্য ২টি এম্বুলেন্স ইত্যাদি সুবিধা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত এই হাসপাতাল থেকে সেবাপ্রাপ্ত রোগীর মোট সংখ্যা ৩,৬৬,৮৭৮ (আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত) এবং অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১০,৭৯৩ (জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত)। দৈনিক সাড়ে ৫ শতাধিক রোগী এ হাসপাতালের বহির্বিভাগে সেবা গ্রহণ করে।

ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা) (২০১৫ সাল)

প্রতিষ্ঠাঃ ২০১৫ সাল।

সেবা কার্যক্রমঃ ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা) ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। এর শয্যা সংখ্যা ৩০টি যার মধ্যে বর্তমানে ৮টি ইনডোর বেড চালু করা হয়েছে। এখানে ৫০ আসনের অটিজম স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৭ জন শিক্ষার্থী এ স্কুলে অধ্যায়নরত।

আউটডোর সার্ভিসে অভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫০ জন অটিস্টিক শিশুকে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী এন্ড হসপিটাল (২০১৮ সাল)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারীর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতাল বিশ্বের সবচেয়ে বড় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানটি পোড়া, দগ্ধ ও শারীরিক বিকৃতির রোগীদের অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবা দেবে। ৩ তলা বেইজমেন্টসহ মোট ১৮ তলা বিশিষ্ট এ প্রতিষ্ঠান তৈরিতে ৯১২.৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। হাসপাতালটিতে জরুরী রোগী স্থানান্তরের জন্য অত্যাধুনিক হেলিপ্যাড রয়েছে। চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশের প্রথম মাইক্রোসার্জারী প্রশিক্ষণ ল্যাব, রোগীদের অত্যাধুনিক নিরাময় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্কিন ও সেল কালচার ল্যাব সংযোজন করা হয়েছে। এই হাসপাতালে আছে ১৮টি অপারেশন থিয়েটার, ২২টি আইসিইউ, ২২টি এইচডিইউ। এখানে রোগীরা বিশেষ বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী সেবা পাবে। যেমন- বার্ন ও রিকনস্ট্রাক্টিভ সার্জারী, ট্রমা এন্ড রিকনস্ট্রাক্টিভ সার্জারী, মাইক্রোসার্জারী, এস্থেটিক এন্ড বেরিয়াট্রিক সার্জারী। হাত ও অন্যান্য অঙ্গেও বিশেষায়িত সার্জারীর সুবিধাসহ আরো নানাবিধ সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল (২০১৮ সাল)

২০১১ সালে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল স্থাপনের অনুমোদন হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায়। মহান স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান শহীদ শেখ রাসেল-এর স্মরণে এর নামকরণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ অক্টোবর ২০১৮ ঢাকার মহাখালীতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নির্মাণ শৈলী এবং চিকিৎসা সমৃদ্ধ দেশের সর্বপ্রথম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। হাসপাতাল প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের মেয়াদে গৃহীত হয়ে বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

সেবা কার্যক্রমঃ এটি বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে প্রথম পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র।

হাসপাতালটি ১০ তলা ভবন বিশিষ্ট। পরিপাকতন্ত্রের জরুরী স্বাস্থ্য সেবার জন্য রয়েছে জরুরী বিভাগ, জরুরী এন্ডোস্কোপি এবং সার্জিকাল ইন্টারভেনশন সুযোগসহ ১০ বেডের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড ও বহির্বিভাগে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ সুবিধা। অন্তঃবিভাগের জন্য রয়েছে সাধারণ বিছানা ও কেবিন। সংকটাপন্ন রোগীদের সেবায় রয়েছে ৮ বেডের আইসিইউ ও ১২ বেডের এইচডিইউ।

হাসপাতালটির চতুর্থ তলায় সর্বাধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত পূর্ণাঙ্গ এন্ডোস্কোপি স্যুটে রয়েছে এন্টারোস্কোপি, এন্ডোসনোগ্রাফি, ইআরসিপিজিআই মেনোমেট্রি, পিএইচমেট্রি, ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি এবং কোলাঞ্জিওস্কোপির মতো আধুনিক সুবিধা। সার্জিকাল বিভাগে রয়েছে চারটি জিআই অপারেশন থিয়েটার। রোগ নির্ণয়ের জন্য রয়েছে ইমেজিং ডিপার্টমেন্ট। ছয়টি সুপরিসর লিফট, অত্যাধুনিক স্মোক ডিটেক্টর, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সহ প্রতি তলায় চারটি জরুরী নির্গমণ পথ, বেইজমেন্ট গাড়ি পার্কিং ও মৃতদেহ সংরক্ষণাগার। পুরো ভবনটিতে রয়েছে পাবলিক এনাউন্সমেন্ট সিস্টেম এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সার্বক্ষণিক সিসি টিভি মনিটরিং। বর্ষার পানি সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, তার সাথে সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য সোলার প্যানেল রয়েছে। ভবিষ্যত পরিকল্পনায় রয়েছে নিজস্ব গবেষণাগার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন (২০১৮ সাল)

প্রতিষ্ঠাঃ ২০১৮ সালে।

অবস্থানঃ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

অন্যান্য উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন চালু করার উদ্দেশ্যে ২০১০-২০১৩ সালে একনেকে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প খরচ ছিলো প্রথমে ১,৩৮,১৩,৬০,০০০ টাকা যা পরে হয়েছে ১,৯৪,৩২,২৪,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানটি চালুর পর্যায়ে। প্রায় ১.৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ১৪ তলা ভবনটিতে কর্মচারী থাকবে ১০৫ জন। ৩০% যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে কেনা হয়ে গেছে। বাকী ৭০% যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

কর্মকর্তার সংখ্যাঃ এই প্রতিষ্ঠানে একজন পরিচালক, তিন জন অধ্যাপক, ৬ জন সহযোগী অধ্যাপকসহ মোট কর্মকর্তার সংখ্যা ২৬ জন।

দশটি বিভাগ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। এগুলো হলোঃ প্রাণরসায়ন, প্যাথলজি, ভাইরোলজি, ক্লিনিকাল প্যাথলজি, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, হেমাটোলজি, রেডিওলজি ও ইমেজিং, মাইক্রোবায়োলজি, এডভান্সড ল্যাবরেটরি এবং এপিডেমিওলজি বিভাগ।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেইনিং (নিপোর্ট) (১৯৭৭ সাল)

পটভূমিঃ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আদর্শ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান তৈরির দিকে দৃষ্টি রেখে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

প্রতিষ্ঠা ও অবস্থানঃ এই প্রতিষ্ঠানটি আজিমপুরে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লোকবলঃ এই প্রতিষ্ঠানে একজন মহাপরিচালক, ৩ জন পরিচালক, ৩ জন উপপরিচালক ও ৫ জন প্রশিক্ষকসহ মোট ৩৭ জন কর্মকর্তা আছেন ।

কার্যক্রমঃ নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী অপারেশনাল গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচি উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও প্যারামেডিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ বিভাগীয় ও জেলা শহরে পর্যায়ে ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-এর মাধ্যমে পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিপোর্টই একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধা সহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নিপোর্টের রয়েছে সুন্দর পরিবেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা।

ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর) (১৯৭৬ সাল)

প্রতিষ্ঠা ও অবস্থানঃ এই প্রতিষ্ঠানটি মহাখালীতে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সুদীর্ঘ ইতিহাসসমৃদ্ধ এই সফল প্রতিষ্ঠান জন্মাবধি অত্যন্ত খ্যাতির সাথে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে মূলতঃ ম্যালেরিয়াকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করলেও পরবর্তীতে এর কর্মপরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৮১ সালে আইইডিসিআর-কে 'জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)-এর সাথে যুক্ত করে বৃহত্তর আঙ্গিকে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান দু'টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপরিধি ভিন্ন হওয়ায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে আরও ব্যাপ্তি প্রদানের নিমিত্তে ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠান দু'টিকে পৃথক করা হয় যা অদ্যাবধি অত্যন্ত সফল একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। এই প্রতিষ্ঠানটিকে ২০০৭ সালে ন্যাশনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা সেন্টারে স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে পরিচালকের কার্যালয়, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, বায়োস্ট্যাটিস্টিকস, শ্বাস রোগতত্ত্ব বিভাগ, পতঙ্গ বিজ্ঞান বিভাগ, মেডিকেল সোস্যাল সায়েন্স, প্যারাসাইটোলজি/পরজীবী বিজ্ঞান বিভাগ, ভাইরোলজি বিভাগ, জুনোসিস বিভাগ ও রোগ প্রাদুর্ভাব তদন্ত বিভাগ মিলিয়ে ১০টি বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও WHO, FETPB, Eco Health Alliance, GHSA Consultant-দের সাথে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান।

২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২০৩টি রোগ ও রোগ প্রাদুর্ভাবের রোগতত্ত্ব বিষয়ে তদন্ত করেছে এই প্রতিষ্ঠান। রোগসমূহের মধ্যে হাম, ডায়রিয়া ও টাইফয়েড প্রাদুর্ভাব, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা ভাইরাস, এনথ্রাক্স, নিপাহ (NIPAH) ভাইরাস, অজ্ঞাত মস্তিস্কের প্রদাহ, বিরল নিউমোনিয়া, কুষ্ঠ সহ বিভিন্ন রোগের রোগতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা ও তদন্ত করেছে। এছাড়া বিভিন্ন রোগের (যেমন-নিপাহ (NIPAH), ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, কলেরা, এনথ্রাক্স, জুনোটিক রোগ ইত্যাদি) রোগতত্ত্ব নজরদারি করাও এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চিকিৎসকসহ সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও বৈঠকের আয়োজন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও নিপাহ ভাইরাস ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যাশনাল গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (১৯৭৮ সাল)

এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শের-ই-বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল দেশের হৃদরোগীদের একমাত্র সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতাল। এখানে হৃদরোগীদের সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এ হাসপাতালের কর্মপরিধি। বর্তমানে এ হাসপাতালে হৃদরোগের সকল আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা সেবা বিদ্যমান রয়েছে। ধনী-গরীব নির্বিশেষে দেশের হৃদরোগীরা অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে এই হাসপাতালে হৃদরোগের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ সর্বোত্তম চিকিৎসা লাভ করছেন। ইতিমধ্যে এ হাসপাতাল দেশের মানুষের আস্থা অর্জনে সামর্থ হয়েছে। হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বর্তমানে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। সাশ্রয় হচ্ছে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। জনগণের এই আস্থা বজায় রাখার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ হৃদরোগীদের জরুরী ও আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে। বর্তমানে অত্র হাসপাতালে অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ৪১৪। এনআইসিভিডি-র ভার্টিকেল এক্সটেনশনের কাজ শেষ হওয়ার পর নুতন বেড সংখ্যা ৮৩৪টি বেড়ে সর্বমোট বেড হবে ১২৪৮টি। বর্তমানে আইসিইউতে বেড আছে ৮টি, ভার্টিকেল এক্সটেনশনের কাজ শেষ হওয়ার পর নুতন আইসিইউ বেড ৩০টি বৃদ্ধি পেয়ে মোট হবে ৩৮টি। এক্সটেনশনের কাজ শেষ হওয়ার পর নুতন কার্ডিওলজি কেবিন হবে ৪০টি। কার্ডিয়াক সার্জারী বিভাগের জন্য কেবিন থাকবে ৮টি। এক্সটেনশনের কাজ শেষ হওয়ার পর নুতন কার্ডিয়াক সার্জারী ওটি হবে ৮টি, ভাসকুলার সার্জারী ওটি হবে ২টি এবং ভাসকুলার ইমার্জেন্সি ওটি হবে ১টি। কিন্তু প্রতিদিন গড়ে ৯০০ থেকে ৯৫০ জন রোগী ভর্তি থাকে। এছাড়াও বহির্বিভাগ ও জরুরী বিভাগে প্রতিদিন প্রায় ১,০০০ রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। অত্র হাসপাতালে কার্ডিওলজি, পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি, ইলেক্ট্রোফিজিওলজি, কার্ডিয়াক সার্জারী, পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারী, ভাসকুলার সার্জারী, এনেস্থেসিওলজি, রেডিওলজি, নিউক্লিয়ার কার্ডিওলজি ও বেসিক সাইন্স বিভাগ চালু আছে। এছাড়া দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে এমডি (কার্ডিওলজি), এমএস (কার্ডিও ভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সার্জারী - সিভিএন্ডটিএস), ডিপ্লোমা ইন কার্ডিওলজি ও রেসিডেন্সি কোর্স চালু রয়েছে। প্রতি বছর এখান থেকে ডিগ্রীধারী দক্ষ জনবল বের হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হৃদরোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এ হাসপাতালে অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ে CAG, PTCA, PTMC, PPM, CABG, Valve Replacement ও Vascular Surgery সহ বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এখানে অত্যাধুনিক সিসিইউ ও আইসিইউ রয়েছে। যেখানে রোগীরা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকে।

সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বর্ণনাঃ

নুতন এনজিওগ্রাম মেশিনঃ বর্তমানে অত্র হাসপাতালে ৪টি এনজিওগ্রাম মেশিন চালু আছে। আরো ২টি এনজিওগ্রাম মেশিন অচিরেই চালু হবে। ইনস্টলেশন কাজ সমাপ্ত হলে একসঙ্গে ৬ জন রোগীর এনজিওগ্রাম করা সম্ভব হবে। রোগীদের বিনামূল্যে ইনজেকশন স্ট্রেপটোকাইনেস (Inj. Streptokinase) সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিটির বাজার মূল্য প্রায় ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত।

ক্যাথ ল্যাবে রোগীদের Inj. Amidol (370 mg/ml) সরবরাহসহ রোগীদের বিনামূল্যে Inj. Enoxaparin সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিনামূল্যে সরবরাহের জন্য স্টেন্ট, ভাল্ব ও অক্সিজেনেটর ক্রয় করা হয়েছে। নুতন ইলেকট্রো ফিজিওলজি (EPS) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে ।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অফথ্যালমোলজি এন্ড হসপিটাল (১৯৭৯ সাল)

প্রতিষ্ঠা ও অবস্থানঃ এই প্রতিষ্ঠানটি শের-ই-বাংলা নগরে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পটভূমিঃ শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁওয়ে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি চক্ষু রোগের চিকিৎসায় দেশে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানে চক্ষু রোগের সব ধরনের অপারেশন ও চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাঃ চক্ষু বিজ্ঞান এবং চক্ষু বিষয়ক সকল পরিচর্যার সর্বোচ্চ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি অত্যাধুনিকভাবে যাত্রা শুরু করে ২০০৭ সালে। ১৯৭৯ সাল থেকে এটি শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শাখা বিভাগ হিসেবে ছিল। সময়ের সাথে সাথে সেবার মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে শের-ই-বাংলা নগরে ৩ একর জমির উপর ১০ তলা ভবনে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৬ তলা ভবনে এর কার্যক্রম চলছে।

লোকবলঃ বর্তমানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৬৩ জন সহ মোট চিকিৎসক ১৩৮ জন। ২০১ জন নার্স। ২৮৮ জন অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী।

সেবা কার্যক্রমঃ এই হাসপাতালটির অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ২৫০। দু'টি স্পাইরাল সিটি স্ক্যান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে বিশ্বমানের চক্ষুরোগ চিকিৎসা ও পরিচর্যা স্বল্প খরচে প্রদান এবং রেটিনা ক্লিনিক, অকুলোপ্লাস ক্লিনিক, গ্লুকোমা ক্লিনিক, কর্নিয়া ক্লিনিক, নিউরো-অফথ্যালমোলজি ক্লিনিক, লো-ভিশন ক্লিনিক, পেডিয়াট্রিক ক্লিনিক ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে । ২০১৭ সালে পেডিয়াট্রিক ক্লিনিকে ৫৩,৭৬০ জন রোগী এবং ১,৪২,২০১ জন রোগী অন্যান্য ৬টি ক্লিনিকে সেবা গ্রহণ করে। এছাড়াও বহির্বিভাগে ৩,৬০,৩৮০ জন, জরুরী বিভাগে ৫,৮৩২ জন এবং অন্তঃবিভাগে ১৭,৩৬৬ জন সেবা পান। বিভিন্ন পর্যায়ের অস্ত্রোপচার হয়েছে ১৬,৬৮৫টি।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ এন্ড হসপিটাল (১৯৮২ সাল)

পটভূমিঃ সরকারি পর্যায়ে একমাত্র বিশেষায়িত ক্যান্সার হাসপাতাল হল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ এন্ড হসপিটাল (জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটউট ও হাসপাতাল)।

প্রতিষ্ঠাঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বর্ধিত অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি মহাখালীতে ১৯৮৬ সালে স্থানান্তর হয়। অন্তঃবিভাগীয় সেবা ১৯৯১ সালে ৫০টি শয্যার মাধ্যমে চালু করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলেই ৫০ শয্যার ছোট্ট হাসপাতাল ৩০০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে কেবিন ব্লকসহ আধুনিক সব যন্ত্রপাতি, নুতন অস্ত্রোপচার কক্ষ, সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা, হাইপোটক্সিক কেমোথেরাপি মিক্সিং চেম্বার, নুতন এমআরআই, সিটি স্ক্যান মেশিনসহ অসংখ্য যন্ত্রপাতি। আছে ব্রাকিথেরাপি মেশিন, সিটি ও কনভেনশনাল সিম্যুলেটর ও ট্রিটমেন্ট প্লানিং সিস্টেম। চালু করা হয়েছে আধুনিক পেশেন্ট কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও কনট্যুরিং ল্যাব। ক্যান্সার এপিডেমিওলজি বিভাগের উদ্যোগে আধুনিক রেকর্ড রুম ও ক্যান্সার তথ্য ডিসপ্লেবোর্ডসহ ছোট বড় অনেক সার্ভিস। এখন পর্যন্ত এখানে কর্মরত চিকিৎসকের সংখ্যা ২২২জন।

সেবা কার্যক্রমঃ এখানে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের জন্য স্বল্পমূল্যে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে ইমিউনো-হিস্টোকেমিস্ট্রি (ER, PR, Her-2) পরীক্ষাসহ সব ধরণের আধুনিক রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে চারটি লাইনাক ও দু'টি কোবাল্ট মেশিন রোগীদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিকিরণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটউট ও হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ৫৫০ রোগীর রেডিওথেরাপি চিকিৎসা দেয়া হয়। প্রতিদিন ডে-কেয়ার হিসেবে প্রায় ১৭৫ জন রোগীকে কেমোথেরাপি দেয়া হয়। আরো প্রায় ১০০ ভর্তি রোগী প্রতিদিন কেমোথেরাপি চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। সব রোগীদের প্রয়োজনীয় কেমোথেরাপি ঔষধের প্রায় ৫০ শতাংশ হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়, যার বাজার মূল্য ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। এখানে পূর্ণ কোর্স রেডিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে সরকারি হারে খরচ পড়ে ৭ থেকে ১৪ টাকা মাত্র। বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে এই হার ২০ গুণেরও বেশি। এছাড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সকল চিকিৎসা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। হতদরিদ্র রোগীরা প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ক্যান্সার চিকিৎসা পেয়ে থাকেন।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (১৯৮৮ সাল)

পটভূমিঃ বাংলাদেশের চিকিৎসায় এক অনন্য সংযোজন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৮১ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সাথে ওটিএমএইচ (Organization in training in Mental Health) হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে ইনডোরে ৫০টি শয্যা চালু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে যুক্ত হয় এবং ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে নুতন ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ এই হাসপাতালটি ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে অবস্থিত। বর্তমানে হাসপাতালে ২০০ শয্যার অন্তঃবিভাগসহ রয়েছে বহির্বিভাগ ও জরুরী বিভাগ। একাডেমিক বিভাগসমূহের মধ্যে এডাল্ট সাইকিয়াট্রি, চাইল্ড এন্ড এডোলোসেন্ট সাইকিয়াট্রি, কমিউনিটি এন্ড সোস্যাল সাইকিয়াট্রি, জেরিয়াট্রিক এন্ড অর্গানিক সাইকিয়াট্রি, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি, এনেস্থেসিয়া, ড্রাগ এডিকশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অন্যতম। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে পিএইচডি, এমডি, এমএস কোর্স চালু রয়েছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রিভেনশন অব রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ (১৯৮৮ সাল)

প্রতিষ্ঠা ও অবস্থানঃ এই প্রতিষ্ঠানটি শের-ই-বাংলা নগরে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পটভূমিঃ ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি সন্তুষ্টির সাথে অসাধারণ কাজ করে যাচ্ছে। ডায়াগনোসিস, ইনভেস্টিগেশন, বিভিন্ন রোগ যেমন রিউমেটিক ফিভার, রিউমেটিক হার্ট ডিজিজেস এবং অনেক অসংক্রামক রোগ যেমন হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, সিওপিডি ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা সেবা এই হাসপাতালটির বহির্বিভাগে দেওয়া হয়ে থাকে।

কার্যক্রমঃ নুতন এবং পুরানো রোগীদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকমন্ডলী দ্বারা চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের মধ্যে রয়েছে কার্ডিওলজিস্ট, পেডিয়াট্রিসিয়ান, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, মেডিকেল অফিসার এবং ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট, যাদেরকে সহযোগিতা করছে সুদক্ষ নার্স, ল্যাব টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি এবং কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট যা অতিদ্রুত এবং সাশ্রয়ী মূল্যে রোগীদের সেবা দিয়ে থাকে। রিউমেটিক ফিভার ও রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ সম্বন্ধে বিভিন্ন জেলা এবং দূরবর্তী উপজেলাগুলোতে ডাক্তার, টেকনোলজিস্ট এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের এই হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে রোগীদের মাঝে সচেতনতা, রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং রোগও নিয়ন্ত্রণের মাঝেই থাকছে।

চিকিৎসা কার্যক্রমঃ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নুতন রোগী ১৮,৭৮৩ জন ও পুরাতন রোগী ৭,৫৫৫ জন। এছাড়াও উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কার্ডিওলজি ইসিজি করা হয়েছে ২,২৬৪টি, ইকো হয়েছে ১,৭৩০টি, ল্যাবরেটরি পরীক্ষা হয়েছে ৪৪,১৭২টি, ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট ৪৮,১৬৬টি এবং সর্বমোট ঔষধপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ২০,৮০১ জন।

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল/বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক পূর্ত কাজ

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
১৯৯৬-২০০১ সাল	উন্নীতকরণ	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (২৫০ থেকে ১৪০০ শয্যায়)	১
২০০৯-২০১৩ সাল	উন্নীতকরণ	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (৩০০ শয্যায়)	১
	নুতন নির্মাণ	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতাল (২৫০ শয্যা)	১
		বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট (১০০ শয্যা)	১
		বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) এন্ড হাসপাতাল, চট্টগ্রাম	১
		জাতীয় নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা	১
		ইএনটি এবং হেড, নেক ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকা	১
		ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি, ঢাকা	১
	নুতন নির্মাণ	শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা	১
		শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, ঢাকা	১
	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	জাতীয় ল্যাব মেডিসিন ও রেফারেল সেন্টার, ঢাকা	১
		জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারণ ও মাদকাসক্ত ইউনিট, ঢাকা	১
	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	আইপিএইচএন ভবন	১
		মোট	১২
২০১৭-২০২২ সাল	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	জাতীয় কিডনী হাসপাতাল (NIKDU); ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতাল; জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ	৪
		বিসিপিএস ভবন	১
		এ্যাজমা সেন্টার	১
	নুতন নির্মাণ	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে বর্জ্য শোধনাগার, ঢাকা	১
		মোট	৭
চলমান প্রকল্প	উন্নীতকরণ	জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা (৬০০ থেকে ১৫০০ শয্যায়)	১
	নুতন নির্মাণ	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন ঢাকা সম্প্রসারণ	১
		এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপাতাল, ঢাকা	১
		ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন মেডিসিন এন্ড হাসপাতাল, ঢাকা	১
		বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার	১
	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল- উত্তর ও দক্ষিণ ব্লকের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প	১
		মোট	৬
		সর্বমোট	২৬

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ এবং হাসপাতাল

এই বইয়ের "চিকিৎসা শিক্ষা" অংশে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলো সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে ১১১টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট রয়েছে ৩৬টি। প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের সাথে একটি করে প্রশিক্ষণ হাসপাতাল রয়েছে। যদিও অতি সম্প্রতি যে মেডিকেল কলেজগুলো চালু হয়েছে সেগুলোতে এখনও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবন নির্মিত হয়নি। আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে তা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নীচের দু'টি সারণীতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোর পরিসংখ্যান দেয়া হলো। এই বইয়ের "চিকিৎসা শিক্ষা" অংশে এগুলোর তালিকা সন্নিবেশিত আছে। অতি সম্প্রতি ৫টি নুতন মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে। এগুলো হলো নেত্রকোনা, নীলফামারী, চাঁদপুর, মাগুরা ও নওগাঁ। এগুলোতে মেডিকেল কলেজ চলছে বিদ্যমান স্বাস্থ্য স্থাপনায়। হাসপাতাল চালুর প্রয়োজন হবে দু'বছর পর। এ সময়ের মধ্যে নুতন হাসপাতাল ভবন নির্মিত হবে।

নীচের সারণীতে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা। উপরে বর্ণিত শুধু ৫টি বাদে এগুলোর প্রতিটিতে একটি করে প্রশিক্ষণ হাসপাতাল রয়েছে।

সরকার	প্রতিষ্ঠাকাল	সরকারি			বেসরকারি	সর্বমোট
		স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	সেনাবাহিনী	মোট		
স্বাধীনতা পূর্বকাল	১৯৪৬-১৯৭১ সাল	৬	-	৬	-	৬
আওয়ামী লীগ সরকার						
বঙ্গবন্ধুর সরকার	১৯৭২-১৯৭৫ সাল	২	-	২	-	২
শেখ হাসিনার সরকার	১৯৯৬-২০০১ সাল	-	১	১	৯	১০
	২০০৯-২০১৩ সাল	৬	-	৬	১৬	২২
	২০১৪-২০১৮ সাল	১৩	৫	১৮	১৩	৩১
	মোট	১৯	৬	২৫	৩৮	৬৩
মোট আওয়ামী লীগ সরকার		২১	৬	২৭	৩৮	৬৫
অন্য সরকার	১৯৯১-১৯৯৫ সাল	৫	-	৫	৮	১৩
	২০০২-২০০৮ সাল	৪	-	৪	২৩	২৭
	মোট	৯	-	৯	৩১	৪০
	সর্বমোট	৩৬	৬	৪২	৬৯	১১১

নীচের সারণীতে বাংলাদেশে ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিটের সংখ্যা। এগুলোর প্রতিটিতে একটি করে প্রশিক্ষণ হাসপাতাল রয়েছে।

সরকার	প্রতিষ্ঠাকাল	সরকারি	বেসরকারি	মোট
স্বাধীনতা পূর্বকাল	১৯৬০ সাল	১	-	১
শেখ হাসিনার সরকার	১৯৯৬-২০০১ সাল	-	৪	৪
	২০০৯-২০১৩ সাল	৬	১২	১৮
	২০১৪-২০১৮ সাল	-	৬	৬
	মোট	৬	২২	২৮
অন্য সরকার	১৯৮৯ সাল	১	-	১
	১৯৯০-১৯৯৬ সাল	১	১	২
	২০০৫ সাল	-	১	১
	২০০৮ সাল	-	৩	৩
	মোট	২	৫	৭
	সর্বমোট	৯	২৭	৩৬

বিভিন্ন হাসপাতালে কি কি নুতন যন্ত্রপাতি, কি কি আধুনিক চিকিৎসা সেবা যুক্ত হয়েছে এবং কত রোগী চিকিৎসা পাচ্ছে তা এই বইয়ের অন্য অংশে বর্ণনা করা হবে। নীচে পূর্ত কর্মকান্ডের কিছু বিবরণ দেয়া হলো।

এক নজরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারসমূহের পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
১৯৯৬-২০০১ সাল	নুতন নির্মাণ	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দ্বিতীয় ইউনিট নির্মাণ	১
		ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইউনিট	১
		মোট	২
২০০৯-২০১৩ সাল	উন্নীতকরণ	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (১০০০ শয্যায়) এ ছাড়া আইসিইউ ও ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট স্থাপন	১
		ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (২৫০ থেকে ৫০০ শয্যায়)	১
	নুতন নির্মাণ	ঢামেকহা জাতীয় ফিস্টুলা সেন্টার ও হাসপাতাল ইউনিট-২	১
	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	৪
		মোট	৭
২০১৪-২০১৮ সাল	নুতন নির্মাণ	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১
		ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১
		মোট	২
২০১৭-২০২২ সাল	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল বহির্বিভাগ ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১
		শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১
		চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আইসিইউ বিল্ডিং ও ডেন্টাল ইউনিটের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ; হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারী ভবনের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরণ; সাবস্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ (১০০০ কেভিএ সাবস্টেশন ও ৫০০ কেভিএ জেনারেটরসহ)	১
		এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিলেট হাসপাতাল ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, নুতন ১০ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ, হাসপাতাল লন্ড্রী ভবন নির্মাণ ও ডেন্টাল ইউনিট প্রতিষ্ঠা	১
		দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১
		ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১
		যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১
	নুতন নির্মাণ	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ	১
		কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল- আইসোলেশন ইউনিট, মসজিদ, কলেজ হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টার	১
		খুলনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল- বহির্বিভাগ ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ; হাসপাতালের নার্স ও স্টাফদের জন্য ডরমেটরী ও মেডিকেল স্টোর ভবন নির্মাণ	১
		নোয়াখালী মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ভবন	১
	লিফট স্থাপন	যাত্রী ও শয্যা বহনকারী লিফট সরবরাহ ও স্থাপন/ পুনঃস্থাপন	২০
	সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল- বার্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা, সংস্কার, জরুরী মেরামত, পরিবর্তন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১
	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল- ডেন্টাল ইউনিট ও বহির্বিভাগের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিট নির্মাণ	১
		মোট	৩৩
চলমান প্রকল্প	উন্নীতকরণ	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, টাংগাইল (২৫০ থেকে ৫০০ শয্যায়)	১
	নুতন নির্মাণ	কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৩
		যশোর, কক্সবাজার, পাবনা ও নোয়াখালী মেডিকেল কলেজে ৫০০ শয্যা হাসপাতাল ও আনুষঙ্গিক ভবনাদি	৪
		শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ	১
		কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ শয্যা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ	১
		শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ শয্যা হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ	১
		শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ	১
		জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ, জামালপুর	১
		পাঁচটি পুরাতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (স্যার সলিমুল্লাহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও রংপুর)	৫

এক নজরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারসমূহের পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড (অবশিষ্টাংশ)

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
		বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিট স্থাপন- ৫টি নির্ধারিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুর)	৫
		হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১
		রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১
		চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১
	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	দেশের ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ও ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ	৮
		মোট	৩৪
		সর্বমোট	৭৮

এক নজরে ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালগুলোর জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারসমূহের পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০১৭-২০২২ সাল	উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল	১
চলমান প্রকল্প	নুতন নির্মাণ	শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ	১
		মোট	২

মাল্টিডিসিপ্লিনারি হাসপাতাল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী ঢাকার বিপুল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য প্রত্যেক প্রান্তে একটি করে ভালো মানের অনেক রোগী ধারণক্ষম মাল্টিডিসিপিনারি হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি বিদ্যমান হাসপাতালগুলো সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রত্যেক প্রান্তে নুতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। বিদ্যমান মাল্টিডিসিপ্লিনারি হাসপাতালগুলো হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে রাজধানী ঢাকার বিপুল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য ঢাকার কুর্মিটোলায় ও মুগদায় একটি করে ৫০০ শয্যার বিশেষায়িত আধুনিক মাল্টিডিসিপ্লিনারি হাসপাতাল নির্মাণ ও চালু হয়।
ছবিতে বামে কুর্মিটোলা ও ডানে মুগদা ৫০০ শয্যার হাসপাতাল।

উত্তরা এলাকার বাসিন্দাদের জন্য তার নির্দেশে কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যার একটি বিশেষায়িত মাল্টিডিসিপ্লিনারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত ও চালু হয়। উত্তরায় কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রি হাসপাতালটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। তার নির্দেশে সেই হাসপাতালটিতে এখন খুবই সফল বহির্বিভাগ চলছে। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসেই ২০০ শয্যার এই হাসপাতালটিতে অন্তঃবিভাগ চালু হবে। মুগদা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় মুগদা ৫০০ শয্যার আধুনিক মাল্টিডিসিপ্লিনারি হাসপাতাল যা এখন

স্বয়ংসম্পূর্ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। তিনি কমলাপুর এলাকার বাসিন্দাদের জন্য ৬০০ শয্যার রেলওয়ে হাসপাতালটিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনার নির্দেশ দেন। যা এখন প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুরাতন ভবনগুলো ভেঙ্গে ফেলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এবং অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই কাজ শুরু হবে ২০১৮ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর। ছবিতে নুতন সেই ভবনগুলোর প্রাথমিক নকশা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুরাতন ভবনগুলো ভেঙ্গে ফেলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এবং অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের নির্দেশ দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই কাজ শুরু হবে ২০১৮ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর। অপরদিকে বহু পুরাতন মিটফোর্ড হাসপাতালটিও নানাভাবে উন্নত ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তবে, চমক অপেক্ষা করছে সামনে। এই হাসপাতালের পুরনো ভবনগুলো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে নুতন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

ঢাকায় আরও প্রচেষ্টা চলছে আন্তজার্তিক মানের ১০০ শয্যার একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার। এ ছাড়া এক্সপানশন অব ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিজ ইন বাংলাদেশ, ঢাকা নামে আর একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

অন্যদিকে দেশের অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদেই তিনি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন জাতির পিতার শহীদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসেরের নামে শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।

এই হাসপাতালটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে।

শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল

হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে। অবস্থান খুলনা শহরের প্রবেশপথে। এই বহুমাত্রিক তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষায়িত হাসপাতালটি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট। এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো এক ছাতার নীচে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। ২০১৭ সালে ৭,৯৩৪ জন রোগীকে জরুরী বিভাগে সেবা দেয়া হয়েছে। ১৬৯টি বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে।

বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর জন্য শেখ হাসিনার সরকারের কিছু পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
১৯৯৬-২০০১ সাল	নুতন নির্মাণ	শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা	১
২০০৯-২০১৩ সাল	নুতন নির্মাণ	২৫০ শয্যা শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ (এক্সিডেন্ট ও ইমার্জেন্সি ব্লক), খুলনা	১
চলমান প্রকল্প	নুতন নির্মাণ	আন্তজার্তিকমানের ১০০ শয্যা ক্যান্সার হাসপাতাল	১
	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	এক্সপানশন অব ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিজ ইন বাংলাদেশ, ঢাকা	১
		মোট	৩
		সর্বমোট	৪

জেলা হাসপাতাল

মধ্যম পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশের জেলা হাসপাতালগুলো অভূতপূর্ব সাফল্যের দাবিদার। জেলা হাসপাতালগুলোতে উপজেলা হাসপাতাল থেকে রেফারড হয়ে আসা জটিল রোগীর সুচিকিৎসা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য এখানে উচ্চ পর্যায়ের হাসপাতালে রেফার করার ব্যবস্থাও আছে। জেলা হাসপাতালের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের ১৯৯৬-২০১৮ মেয়াদের ১৯টি উন্নয়নমূলক পূর্ত কাজের বিবরণ নীচে দেয়া হলো। তবে ২০১৭-২০২২ সালের জন্য রাখা হয়েছে ৬৬টি পূর্ত কাজ যা জেলা হাসপাতালগুলোতে নুতন ধারা সৃষ্টি করবে।

জেলা হাসপাতালগুলোকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে।
উন্নীত এমন বহু জেলা হাসপাতালের মধ্যে মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতাল একটি।

জেলা হাসপাতালগুলোর জন্য শেখ হাসিনার সরকারের কিছু পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	উন্নীতকরণ	নড়াইল ও গাজীপুর (৫০ থেকে ১০০ শয্যায়)	২
	নুতন নির্মাণ	জেলা হাসপাতালে আইসিইউ ও ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট (সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, বগুড়া ও দিনাজপুর)	৭
		মোট	৯
২০১৪-২০১৮ সাল	উন্নীতকরণ	মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, মানিকগঞ্জ, টঙ্গী, সিরাজগঞ্জ ও গাজীপুর (১০০ থেকে ২৫০ শয্যায়)	৯
		নেত্রকোনা (৫০ থেকে ১০০ শয্যায়)	১
		মোট	১০
২০১৭-২০২২ সাল	উন্নীতকরণ	পিরোজপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি, খাগড়াছড়ি, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, নরসিংদী, লক্ষ্মীপুর, মেহেরপুর, নেত্রকোনা, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী ও বান্দরবান (১০০ থেকে ২৫০ শয্যায়)	১৪
		ভোলা, সুনামগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নীলফামারী, হবিগঞ্জ, শেরপুর, কুড়িগ্রাম, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর, নাটোর, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, বরগুনা, বাগেরহাট, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ (৫০/১০০/১৫০ থেকে ২৫০ শয্যায়)	১৯
		নারায়ণগঞ্জ হাসপাতাল (১ম পর্যায়) (২০০ থেকে ৫০০ শয্যায়)	১
	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল (ডায়রিয়া ওয়ার্ড)	১
		পাবনা ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের নুতন ভবন	১
		নোয়াখালী ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতাল (আইসোলেশন ওয়ার্ডের নুতন ভবন। এ ছাড়া অস্থায়ী শেড নির্মাণ)	১
	নুতন নির্মাণ	কুড়িগ্রাম জেলা হাসপাতাল	১
		২৫০ শয্যা হাসপাতাল, সিলেট	১
		উন্নয়ন, সংস্কার ও নুতন ভবন নির্মাণ (রাঙ্গামাটি, খুলনা ও বরিশাল)	৩
		মানিকগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও ২ তলা মেডিকেল স্টোর ভবন নির্মাণ	১
		দিনাজপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও গুদামঘর ভবন নির্মাণ	১
		নোয়াখালী ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে হাটার পথ ও বেষ্টনী তৈরির কাজ	১
		জেলা হাসপাতালে মেডিকেল গ্যাস সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	২০
		মোহাম্মদ আলী ২৫০ শয্যা হাসপাতালে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিট প্রতিষ্ঠা	১
		মোট	৬৬
		সর্বমোট	৮৫

উপজেলা হাসপাতাল

একটি উপজেলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ পৌঁছে দেওয়ার প্রধান সেবাকেন্দ্র হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এটি একটি রেফারেল সেন্টার যেখানে ইউনিয়ন সেন্টার এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ও মাঠ পর্যায় হতে রোগী রেফার করা হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবার জন্য জরুরী বিভাগ, বহির্বিভাগ, অন্তঃবিভাগ, মা ও নবজাতক বিভাগ, ইপিআই, শ্বাসযন্ত্রের তীব্র প্রদাহ (এআরআই), পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, ডায়রিয়া কর্ণার এবং অন্যান্য সাপোর্ট ইউনিট (যেমনঃ ল্যাব, এক্স-রে ইত্যাদি) বিদ্যমান।

উপজেলা হাসপাতালগুলোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের ১৯৯৬-২০১৮ সাল ও ২০১৭-২০২২ সাল মেয়াদের উন্নয়নমূলক পূর্ত কাজগুলোর বিবরণ পরের পাতায় দেয়া হলো। ২০১৭-২০২২ সালের উন্নয়ন কর্মসূচিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিপুল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ফলে জ্বরাজীর্ণ উপজেলা হাসপাতাল আর চোখে পড়বে না।

উপজেলা হাসপাতালগুলোর জন্য শেখ হাসিনার সরকারের কিছু পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	পুনর্নির্মাণ	৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল (দক্ষিণ সুরমা, সিলেট ও কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা)	২
২০১৪-২০১৮ সাল	উন্নীতকরণ	সৈয়দপুর হাসপাতাল (৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ)	১
	পুনর্নির্মাণ	৫০ শয্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (ধনবাড়ী, জুরী, আশুগঞ্জ ও কমলগঞ্জ)	৪
		মোট	৫
২০১৭-২০২২ সাল	নুতন নির্মাণ	নুতন উপজেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	১২
	সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	বিদ্যমান স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুনর্গঠন ও সংস্কার	৩৪
		মোট	৪৬
		সর্বমোট	৫৩

১০, ২০, ৩১ বা ৫০ শয্যা হাসপাতাল

সরকারি উপজেলা হাসপাতালের পাশাপাশি দেশে সরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো ১০, ২০, ৩১ বা ৫০ শয্যার হাসপাতালও রয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে এই হাসপাতালগুলোর জন্য সমাপ্ত বা চলমান পূর্ত কাজের বিবরণ নীচে দেয়া হলো।

সেন্ট মার্টিন ১০ শয্যা হাসপাতাল, কক্সবাজার

১০, ২০, ৩১ বা ৫০ শয্যা হাসপাতালগুলোর জন্য শেখ হাসিনার সরকারের কিছু পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	নুতন নির্মাণ	২০ শয্যা হাসপাতাল (কলাপাড়া, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী; দিরাই-জগদল, সুনামগঞ্জ ও মঙ্গলকান্দি, সোনাগাজী, ফেনী)	৩
২০১৪-২০১৮ সাল	নুতন নির্মাণ	২০ শয্যা হাসপাতাল (মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, নুনগোলা, বগুড়া)	১
		১০ শয্যা হাসপাতাল (মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ডোমার, নীলফামারী)	১
		২০ শয্যা হাসপাতাল (তারাবুনিয়া, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর; বাগমারা, লাকসাম, কুমিল্লা; মালিগাঁও, দাউদকান্দি, কুমিল্লা)	৩
		২০ শয্যা হাসপাতাল	১১
		৩১ শয্যা হাসপাতাল (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা ও খাদিমপাড়া, সিলেট)	২
		মোট	১৮
২০১৭-২০২২ সাল	নুতন নির্মাণ	৩১ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	২
	উন্নীতকরণ	১০ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	১
	উন্নীতকরণ	২০ বা ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	৪৫
	উন্নীতকরণ	২০ বা ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ (২০ বা ৩১ থেকে ১০০ শয্যায়)	১৩
		মোট	৬১
		সর্বমোট	৮২

অন্যান্য হাসপাতাল

উপরের বিভিন্ন ধরণের হাসপাতালের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু বিভিন্ন ধরণের হাসপাতালের নুতন নির্মাণ বা উন্নয়ন কাজ হয়েছে। এমন কি জনহিতকর বেসরকারি অলাভজনক উদ্যোগকেও সমর্থন দেয়া হয়েছে। নীচে এমন কিছু পূর্ত কাজের বিবরণ দেয়া হলো।

এক নজরে অন্যান্য হাসপাতালের জন্য পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

সংক্রামক রোগ হাসপাতাল

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০১৭-২০২২ সাল	সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	সংক্রামক রোগ হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকার পারিপার্শ্বিক সড়ক ও অন্যান্য সুবিধাদির উন্নয়ন	১

ট্রমা সেন্টার

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	নুতন নির্মাণ	ধামরাই, টাংগাইল ও বাহুবল (হবিগঞ্জ) জেলায়	৩
চলমান প্রকল্প	নুতন নির্মাণ	গোপালগঞ্জ	১
		মোট	৪

ডায়াবেটিক হাসপাতাল

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	নুতন নির্মাণ	১০০ শয্যা (পঞ্চগড় ও খুলনা)	২

শিশু হাসপাতাল

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	ঢাকা শিশু হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	১
২০১৭-২০২২ সাল	নুতন নির্মাণ	ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল	৬
চলমান প্রকল্প	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ প্রকল্প-২	১
		মোট	৮

যক্ষ্মা/বক্ষব্যাধি হাসপাতাল

প্রকল্পের মেয়াদ	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	যক্ষ্মা হাসপাতাল	নুতন নির্মাণ	ঢাকার শ্যামলীতে ২৫০ শয্যা যক্ষ্মা হাসপাতাল (১ম পর্যায় ১৫০ শয্যা)	১
২০১৭-২০২২ সাল	বক্ষব্যাধি হাসপাতাল	পুনর্নির্মাণ	বিদ্যমান বক্ষব্যাধি হাসপাতালের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ	৫
			বিদ্যমান বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ	৪৫
			মোট	৫০
			সর্বমোট	৫১

সরকারি কর্মচারী হাসপাতালসহ অন্য ২১টি হাসপাতাল

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	উন্নীতকরণ	সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ১৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	১
২০১৭-২০২২ সাল	পুনর্নির্মাণ	২১টি হাসপাতাল	২১
		মোট	২২

ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর কিছু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিচালিত। আর কিছু পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিচালিত। এগুলো থেকে বহির্বিভাগীয় সেবা দেয়া হয়। শুক্রবার বাদে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ২.৩০টা পর্যন্ত এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো খোলা থাকে। সকল ধরণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ বিনামূল্যে ঔষধ দেয়া হয় এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে।

এগুলোর প্রতিটির জন্য চিকিৎসকের পদ রয়েছে। তবে, চিকিৎসক সংকটের কারণে চিকিৎসক পদায়ন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। যদিও বেশ কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এমবিবিএস চিকিৎসক রয়েছেন।

সম্প্রতি ৯৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৯৮টি মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৩৪টি পদে ইতোমধ্যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মিডওয়াইফরা নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ প্রসূতি সেবা, নিরাপদ স্বাভাবিক সন্তান জন্মদান ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৭-২০২২ মেয়াদে ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যাপক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ৫ বছর সময়কালে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো একাধিকবার মেরামতের সুযোগ রাখা হয়েছে। অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নুতন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হবে। কিছু রুরাল ডিসপেন্সারিকে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে। এ ছাড়া ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নুতনভাবে নির্মাণ করা হবে।

নীচে ২০১৭-২০২২ সালের ইউনিয়ন পর্যায়ের পূর্ত কাজগুলোর বিবরণ দেয়া হলোঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর চলমান পূর্ত উন্নয়ন কাজ (২০১৭-২০২২ সাল)

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
আরবান হেলথ ডিসপেন্সারি	পুননির্মাণ	আরবান হেলথ ডিসপেন্সারি ও স্কুল হেলথ ক্লিনিক পুনর্গঠন/পুননির্মাণ, ঢাকা	৪
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	নুতন নির্মাণ	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	২০৮
		সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৪৩৮
	পুননির্মাণ	পুননির্মাণ	১১১
	সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	বিদ্যমান স্থাপনার উন্নয়ন ও সংস্কার	৪৯
		অবকাঠামো পুনর্গঠন ও নির্মাণ	১৬০
		অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কার	৮,০০০
		পুনর্গঠন, সংস্কার ও বর্ধিতকরণ	৪৯
		রুরাল ডিসপেন্সারিকে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তর	১২
		মোট	৯,০২৭
		সর্বমোট	৯,০৩১

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০১৭-২০২২ সাল	নুতন নির্মাণ	১০ শয্যা ৯৫টি ও ২০ শয্যা ২টি	৯৭

কমিউনিটি ক্লিনিকঃ একটি গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্থাপিত কমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তা প্রসূত একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম। এটি বর্তমান সরকারের সাফল্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত যা দেশে-বিদেশে দারুনভাবে নন্দিত। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠনের পরপরই কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প গ্রহণ করেন। তিনি প্রায়শঃ বলে থাকেন এটি তার প্রয়াত পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল তৃণমূলে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর মহান ইচ্ছায়। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে হয়ত তার হাত দিয়েই এই মহান কীর্তি রচিত হতো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রকল্পটি অনুমোদন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সালের মধ্যেই ১০ হাজারের বেশী কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করেন। এর মধ্যে ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়। কিন্তু, পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প বাতিল করে দেয়। ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত চালু কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ ছিল। নির্মিত ১০ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের অনেকগুলোই ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে সরকার গঠনের প্রথম বছরেই ২০০৯ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করেন। ৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পে ১৩,৫০০ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেয়া হয়। বন্ধ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করা হয়। মেরামতযোগ্য ভবনগুলো মেরামত করা হয়। নুতন নুতন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়। যেগুলো মেরামত অযোগ্য সেগুলো পুনর্নিমাণ করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকারের ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক ভবন নির্মাণের জন্য নুতন ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ডিজাইন নির্বাচন করে দিয়েছেন।
ইতিমধ্যে নুতন ডিজাইন অনুযায়ী নুতন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

৫ বছর পার হয়ে গেলে ৩য় এবং ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১১-২০১৬ এবং ২০১৭-২০২২-তে কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার নামক অপারেশনাল প্লান অন্তর্ভূক্ত করে কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মসূচিকে চালু এবং বেগবান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালোবাসার নিদর্শন কমিউনিটি ক্লিনিক। এখানে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগকৃত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের চাকুরী স্থায়ীকরণ এবং তাদের সরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোর মত চাকুরীগত সুবিধা প্রদানকল্পে এবং সেই সঙ্গে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর টেকসই স্থায়ীত্ব এবং সাবলম্বিতা নিশ্চিতকল্পে সম্প্রতি সমাপ্ত মহান জাতীয় সংসদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্ট আইন পাশ করেন। আইন অনুযায়ী শীগগীরই ট্রাস্ট কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প এবং অপারেশনাল প্লানগুলোর লক্ষ্য অনুযায়ী ১৪,৮৯০টি স্বতন্ত্র কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও চালুর পরিকল্পনা ছিল। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলো মিলিয়ে মোট সংখ্যা হতো ১৮ হাজারের বেশী। ইতিমধ্যে ১৩,৭৭৯টি স্বতন্ত্র কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্ট চালু হলে ট্রাস্ট কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার নুতন ভাবনা তৈরি করতে পারে। তবে অপারেশনাল প্লান বাস্তবায়নকালীন সময়ে কমিউনিটি ক্লিনিক ভবন নির্মাণের জন্য নুতন ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ডিজাইন নির্বাচন করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে নুতন ডিজাইন অনুযায়ী নুতন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক ভবনগুলো দেখতে উপরের ছবির মত।
নুতন ডিজাইন অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো নির্মিত হলে
কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ভবিষ্যতের উন্নত বাংলাদেশের প্রতীক হয়ে উঠবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের চমৎকার উদাহরণ। সকল কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে উঠেছে জনগণের দান করা জমিতে। সরকার ভবন নির্মাণ, সেবাদানকারী নিয়োগ, ঔষধসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করছে। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করছে সরকার। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার জন্য সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নিয়ে ন্যূনতম ৪ জন নারী সদস্যসহ ১৩ থেকে ১৭ সদস্যের কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি) রয়েছে। সিজিকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে প্রতিটি ১৩ থেকে ১৭ সদস্যের ৩টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ। ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও এনজিওসমূহ (বিশ্বব্যাংক, জাইকা, ইউনিসেফ ইত্যাদি) আর্থিক, কারিগরি ও লজিস্টিক সরবরাহের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশ নিচ্ছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেঃ

- মা ও নবজাতক ও অসুস্থ শিশুর সমন্বিত সেবা (আইএমসিআই);
- প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা;
- টিকাদান ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ;
- পুষ্টি শিক্ষা ও অনুপুষ্টি সরবরাহ;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা;
- বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান;
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা;
- সাধারণ আঘাত ও জখম;
- অন্যান্য অসংক্রামক রোগ সনাক্তকরণ;
- রেফারেল ইত্যাদি

কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যকর্মী কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ৯:০০টা হতে বিকেল ৩:০০টা পর্যন্ত সেবা দিয়ে থাকে। গ্রামে কর্মরত সরকারি স্বাস্থ্য মাঠকর্মী স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী পরিবার কল্যাণ সহকারী সপ্তাহে তিনদিন করে সিএইচসিপিকে সেবাদানে সহযোগিতা করে থাকে। সিএইচসিপিদের চাকুরীতে প্রবেশের পর ৩ মাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের অধিকতর বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ করে তোলা হয়েছে। স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মরত সকল নারী সিএইচসিপিকে ৬ মাসের কমিউনিটি স্কীলড বার্থ এটেন্ডেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১,৯৩৫ জন সিএইচসিপি এই প্রশিক্ষণ লাভ করেছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের উপকারভোগী গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায়/নাজুক মা ও শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়োবৃদ্ধ নাগরিক। এই শ্রেণীর মানুষ আগে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত ছিলো। এখন তারা একেবারে ঘরের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে।

২০০৯ থেকে আগষ্ট ২০১৮ পর্যন্ত সব কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ সেবা নিয়েছে ৭৫ কোটিরও বেশী বার। ৩.৬৯ কোটিরও বেশী রোগীকে জরুরী ও জটিলতার জন্য উচ্চতর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। প্রতিমাসে গড়ে ১ কোটি ক্লায়েন্ট আসে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে সেবা নিতে। দৈনিক প্রত্যেক ক্লিনিকে আসে গড়ে ৪০ থেকে ৪২ জন সেবাগ্রহীতা। সেবাগ্রহীতাদের শতকরা ৮০ ভাগই নারী ও শিশু। সারাদেশে প্রায় ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব করানোর সেবা দেয়া হচ্ছে। ২০০৯ থেকে ক্রমান্বয়ে শুরু হওয়া এ ব্যবস্থায় এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই জটিলতা হয়নি। আগেই বলা হয়েছে বছরব্যাপী প্রতিটি ক্লিনিক থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ৩০ রকমের ঔষধ রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বিতরণ করা হয়। প্রতি বছর এ খাতে ব্যয় হয় প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

কমিউনিটি ক্লিনিক যুগান্তকারী একটি নুতন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তা হলো মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার নিয়োগ। পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক সংলগ্ন এলাকার ২৫০ থেকে ৩০০টি বাড়ির জন্য ১ জন করে মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার মনোনীত করা হচ্ছে। এজন্য সারাদেশে ৭০ হাজারেরও বেশী মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার নিয়োগ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক সংলগ্ন এলাকার পরিবারগুলোর সদস্যদের স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে যথাযথ সেবা দেয়া হবে। এটি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার একটি পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে প্রণয়নকৃত রেফারেল কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রেফারেল ব্যবস্থাও শক্তিশালীকরণ করা হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম শক্তিশালী দিক হলো এর তদারকি ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা। এর ফলে কর্মীরা কাজে মনোযোগ দেয় এবং সেবা নিশ্চিত করে। অল্প সময়ের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে সযত্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিপুল জনপ্রিয়তারও একটি অন্যতম কারণ তার এই অবিস্মরণীয় অবদানটি। এজন্য একটি জনপ্রিয় কথা চালু হয়ে গেছে। তা হলো- **শেখ হাসিনার অবদান। কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ।**

শেখ হাসিনার আমলে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর পূর্ত উন্নয়ন কাজ

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
১৯৯৬-২০০১ সাল	নুতন নির্মাণ	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা ও চালুকরণ	৪,০০০
২০১৭-২০২২ সাল	নুতন নির্মাণ	নুতন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১,০২৯
	পুননির্মাণ	পুননির্মাণ	২,০০০
	সংস্কার, উন্নয়ন	বিদ্যমান কমিউনিটি ক্লিনিকের পুনর্গঠন ও সংস্কার	৫০০
		মোট	৩,৫২৯
		সর্বমোট	৭,৫২৯

হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি

২০০৮ সালে ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচনের পর ২০০৯ সালের শুরুতে বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালসমূহে শয্যা সংখ্যা ছিল ৩৮,১৭১টি। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪৫,৬২১-এ উন্নীত করে। ৫ বছরে শয্যা সংখ্যা বাড়ে ৭,৪৫০টি। ২০১৮ সালের শুরুতে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯,০১৮-তে। অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছরে বাড়ে ৩,৩৯৭টি। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে বাড়ে ১০,৮৪৭টি। ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে বেশ কয়েকটি নুতন বৃহৎ পরিসরের হাসপাতাল উদ্বোধন হয়েছে। যেমন শেখ হাসিনা ন্যাশনাল বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট; শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল; ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশনের সম্প্রসারিত নুতন হাসপাতাল ভবন।

দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন খাতে অনেক সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পুঞ্জিভূত এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১১,১৯৫টিতে। কিন্তু, সেগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের উদ্যোগ সফল হয়নি। ফলে প্রতি বছরই ভর্তি রোগীদের পথ্য সরবরাহ করতে অসুবিধা হতো এবং বিশেষ বরাদ্দ নিয়ে সমস্যা সমাধান করতে হতো। অর্থ মন্ত্রণালয় ২০১৮ সালে প্রথম বারের মত একত্রেই ১১,১৯৫টি সরকারি হাসপাতাল শয্যা রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে। ফলে এ বিষয়ে একটি চিরস্থায়ী সমাধান হয়। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পথ্যের ব্যাপারে হাসপাতাল ব্যবস্থাপকগণকে আর কোন দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে সরকারি হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধির চিত্র

মালিকানা	হাসপাতাল						হাসপাতাল শয্যা					
	সাল			বৃদ্ধি			সাল			বৃদ্ধি		
	২০০৮	২০১৩	২০১৮	২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০০৯-২০১৮	২০০৮	২০১৩	২০১৮	২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০০৯-২০১৮
সরকারি	৫৮৯	৫৯৩	৬০৪	৪	১১	১৫	৩৮,১৭১	৪৫,৬২১	৪৯,০১৮	৭,৪৫০	৩,৩৯৭	১০,৮৪৭
বেসরকারি	২,২৭১	২,৯৮৩	৫,১৩৯	৭১২	২,১৫৬	২,৮৬৮	৩৬,২৪৪	৪৫,৪৮৫	৮৬,৫০০	৯,২৪১	৪১,০১৫	৫০,২৫৬
মোট	২,৮৬০	৩,৫৭৬	৫,৭৪৩	৭১৬	২,১৬৭	২,৮৮৩	৭৪,৪১৫	৯১,১০৬	১৩৫,৫১৮	১৬,৬৯১	৪৪,৪১২	৬১,১০৩

সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী সংখ্যা

২০১৭ সাল (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠান		রোগীর সংখ্যা (বহির্বিভাগ)		রোগীর সংখ্যা (জরুরী বিভাগ)		রোগীর সংখ্যা (ভর্তি)	
	সংখ্যা	রিপোর্ট প্রদানকারী (%)	প্রতিবেদিত	অনুমিত	প্রতিবেদিত	অনুমিত	প্রতিবেদিত	অনুমিত
স্নাতকোত্তর ও বিশেষায়িত হাসপাতাল	১২	৫৯	১৩৯৬৮১৩	২৩৬৪৬৭৪	২৬৪৮৫৮	৪৪৮৩৮০	১৬২৪৭৯	২৭৫০৬২
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৭	৯২	৭১৯২৬৮৯	৭৮৬০৮৬২	১৪৫১৫২৮	১৫৮৬৩৬৯	১৪৪৫৪৬৬	১৫৭৯৭৪৪
জেলা/ জেনারেল হাসপাতাল	৬৪	৯৯	১১৪৩০৬৪৫	১১৫১৮১৮৩	২৪৯৭৩৯৭	২৫১৬৫২৩	১৮৬২৯৬২	১৮৭৭২২৯
১০, ২০, ৩১, ৫০ ও ১০০ শয্যা হাসপাতাল	৪৮	৬৫	৫০৯৫৫৭	৭৮৬৩৫৩	৬১৬৩৬	৯৫১১৭	৩৫২৫৬	৫৪৪০৭
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স	৪৩২	৯৯	২৩৭২৫৯৫৭	২৩৯৮৭৪২০	৩৩৫২৯৪৪	৩৩৮৯৮৯৪	২২৪৫২৬২	২২৭০০০৫
বক্ষব্যাধি বা টিবি ক্লিনিক এবং হাসপাতাল	৫৬	২৯	২৫৫১	৮৭৭৮	০	০	৬২০	২১৩৪
সংক্রামক রোগ হাসপাতাল	৫	৪৩	৩৪১০১	৮০২৩৮	৬৮৯০	১৬২১২	৬৫৭৯	১৫৪৮০
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৩১০৫	৯৮	৮৮৪৮৫২৯৪	৯০৪৩৮৭৭১				
মোট			১৩২৭৭৭৬০৭	১৩৭০৪৫২৭৯	৭৬৩৫২৫৩	৮০৫২৪৯৫	৫৭৫৮৬২৪	৬০৭৪০৬১

২০১৮ (জানুয়ারি-অক্টোবর)

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠান		রোগীর সংখ্যা (বহির্বিভাগ)		রোগীর সংখ্যা (জরুরী বিভাগ)		রোগীর সংখ্যা (ভর্তি)	
	সংখ্যা	রিপোর্ট প্রদানকারী (%)	প্রতিবেদিত	অনুমিত	প্রতিবেদিত	অনুমিত	প্রতিবেদিত	অনুমিত
স্নাতকোত্তর ও বিশেষায়িত হাসপাতাল	১২	৬২	১৩৯২০৯৫	২২৪৫৩১৫	১৯৯৬৪৬	৩২২০১০	১০৯৭৭৪	১৭৭০৫৫
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৭	৮৮	৬৮৯৫১০০	৭৮৩৮৯০৪	১৬০৫৭২৫	১৮২৫৫১৭	১২৫১৮২৭	১৪২৩১৭৮
জেলা/ জেনারেল হাসপাতাল	৬৪	৯৮	১০১৪৫১৫৪	১০৩৬৯৭৩	২১১৫২৯১	২১৪৯০৩১	১৫৬৯৭২৮	১৫৯৪৭৬৬
১০, ২০, ৩১, ৫০ ও ১০০ শয্যা হাসপাতাল	৪৮	৭০	৩৫৩৮৪৩	৫০৩৭৬৩	৩৭২৫৯	৫৩০৪৫	২৭২০৫	৩৮৭৩১
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৪৩২	১০০	২০৬৬৮০০৩	২০৭৪২৬৭৭	৩১২৯৭৭৩	৩১৪১০৮১	১৯২৬৮৫৭	১৯৩৩৮১৯
বক্ষব্যাধি বা টিবি ক্লিনিক এবং হাসপাতাল	৫৬	৪০	২৩২৪	৫৭৬২	০	০	৫২৭	১৩০৭
সংক্রামক রোগ হাসপাতাল	৫	৪৪	৩০১২২	৬৭৯৯৫	৬৯৭১	১৫৭৩৬	৬২৭৫	১৪১৬৫
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৩১০৫	৯৩	৬০৯০৩২৬৫					
মোট			১০০৩৮৯৯০৬	৪১৭১১৩৮৯	৭০৯৪৬৬৫	৭৫০৬৪২০	৪৮৯২১৯৩	৫১৮৩০২১

MODE
SET

স্বাস্থ্যসেবায় আধুনিক যন্ত্রপাতি

উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতির। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের ২০০৯-২০১৮ সাল মেয়াদে সরকারি হাসপাতালগুলোতে অনেক নুতন নুতন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ইনস্টিটিউট, বিশেষায়িত হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে এ সময়ে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির কিছু তথ্য নীচে সন্নিবেশ করা হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের ২০০৯-২০১৮ সাল মেয়াদে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ইনস্টিটিউট, বিশেষায়িত হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির কিছু তথ্য (সংখ্যা)

আধুনিক যন্ত্রপাতি	২০০৯-২০১৩ সাল	২০১৪-২০১৮ সাল	মোট
এমআরআই	৯	১৫	২৪
সিটি স্ক্যান	১১	২০	৩১
অটো এনালাইজার	৩৮	৯০	১২৮
ইকো কালার ডপলার	২৮	৪৩	৭১
ব্রঙ্কোস্কোপ মেশিন	৫	১৭	২২
ব্রাকিথেরাপী মেশিন	৩	৫	৮
কোবাল্ট মেশিন	-	৪	৪
আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন	৮১	১২৭	২০৮
এক্স-রে	১২১	৯৮	২১৯
মোট	২৯৬	৪১৯	৭১৫

উন্নতর সেবা প্রদানের জন্য দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ, সিসিইউ, এইচডিইউ, এনআইসিইউ, স্ক্যানু, ক্যাথ ল্যাব, ডায়ালাইসিস ইউনিট, বার্ন ইউনিট, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত সেবা ইউনিট চালু আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০০৯-২০১৮ মেয়াদকালে স্থাপিত এ ধরনের কিছু ইউনিটের তথ্য পরের পাতায় দেয়া হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০০৯-২০১৮ মেয়াদকালে স্থাপিত বিভিন্ন আধুনিক ও বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ইউনিটের তথ্য (সংখ্যা)

বিশেষায়িত সেবা	২০০৯-২০১৩ সাল	২০১৪-২০১৮ সাল	মোট
অপারেশন থিয়েটার	৭৭	৮৫	১৬২
আইসিইউ	১২	১৫	২৭
সিসিইউ	৯	১০	১৯
এইচডিইউ	১	৮	৯
এনআইসিইউ	-	৪	৪
স্ক্যানু	৫	২২	২৭
ডায়ালাইসিস	৫	১২	১৭
ক্যাথ ল্যাব	৮	৫	১৩
বার্ণ ইউনিট	৩	৮	১১
মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট	১	৫	৬
মোট	১২১	১৭৪	২৯৫

স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (স্ক্যানু)।
বর্তমানে ৪৩টি সরকারি হাসপাতালে স্ক্যানু রয়েছে।

ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনের মত আধুনিক যন্ত্রপাতি এখন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে

দেশের সরকারি হাসপাতালসমূহে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির তথ্য (২০১৮ সাল) (সংখ্যা)

যন্ত্রের নাম	বিশেষায়িত হাসপাতাল	মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	জেলা হাসপাতাল	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	বক্ষব্যাধি/ যক্ষা ক্লিনিক এবং হাসপাতাল	১০, ২০, ৩১, ৫০ ও ১০০ শয্যা হাসপাতাল	সর্বমোট
কলোরিমিটার	২	২	১৪১	৩৭৮	১	১	৫২৫
ইইজি	৫	৫	৫	৭	০	০	২২
ল্যাপারোস্কোপ	৪	৪	৫৪	৯	০	০	৭১
স্পেকট্রোফটোমিটার	১	১	১০	৮৬	০	০	৯৮
আল্ট্রাসনোগ্রাম	১৯	১৯	১৫৮	২৬৮	০	২	৪৬৬
এনেস্থেসিয়া মেশিন	৪০	৪০	৩১৮	৪৪২	০	৫	৮৪৫
ইসিজি	২৭	২৭	২৬০	৬৫৭	২	৬	৯৭৯
এক্স-রে	২২	২২	২৩৩	৪৬৬	২১	৫	৭৬৯
এন্ডোসকপি	২	২	৮	১	০	০	১৩
এমআরআই	৩	৩	৬	১	০	০	১৩
কোবাল্ট-৬০	০	০	০	২	০	০	২
ডিফিব্রিলেটর	১০	১০	৩৭	২৭	০	০	৮৪
ভেন্টিলেটর	৪৭	৪৭	৮৫	১৪৫	০	১	৩২৫
লিনিয়ার এক্সিলারেটর	০	০	১	৩৩	০	০	৩৪
সি-আর্ম	৩	৩	২৪	৩	০	০	৩৩
সিটি স্ক্যান	৪	৪	৪	৩	০	০	১৫
স্লিট ল্যাম্প	০	০	৬৮	১৩৫	৬	৩	২১২
সর্বমোট	২০০	২০০	১,৫৭০	৩,২৭০	৩০	২৮	৫,২৯৮

২২ অক্টোবর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার কার্যালয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ে তদারকি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এম্বুলেন্স, নৌ এম্বুলেন্স, জীপ গাড়ি ও মোটর সাইকেল আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করেন।
উপরে ও নীচে তারই কিছু ছবি।

২২ অক্টোবর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক এম্বুলেন্স, নৌ এম্বুলেন্স, জীপ গাড়ি ও মোটর সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নৌ এম্বুলেন্সের একটি স্মারক উপহার দেয়া হয়।

রোগী পরিবহনের জন্য এম্বুলেন্স এবং তদারকির জন্য গাড়িবহর সম্প্রসারণ

রোগী পরিবহন জরুরী স্বাস্থ্যসেবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দ্রুততম সময়ে একটি মানসম্পন্ন এম্বুলেন্স সার্ভিস অনেক মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের ১৬ কোটি মানুষের জরুরী স্বাস্থ্যসেবার পরিবহন চাহিদা পূরণ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। প্রয়োজন হাজার হাজার এম্বুলেন্সের। নৌ এম্বুলেন্সসহ স্বাস্থ্য বিভাগের প্রায় সহস্র এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের এম্বুলেন্স সার্ভিস দেশের জরুরী রোগী পরিবহনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উন্নততর জরুরী স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সর্বজনীন কার্যকর এম্বুলেন্স সেবা প্রবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হবে।

বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৮০০টি এম্বুলেন্স রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সচল রয়েছে ৬৩৯টি।

বিভিন্ন পর্যায়ে সচল এম্বুলেন্সের সংখ্যাঃ

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সঃ ৪৬৯টি
- জেলা হাসপাতালঃ ১১১টি
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঃ ৪৩টি
- স্নাতকোত্তর ও বিশেষায়িত হাসপাতালঃ ১৬টি

২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫০০-রও অধিক এম্বুলেন্স বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বিতরণ করা হয়েছে।

নৌ এম্বুলেন্স দেয়া হয়েছে ২০টি।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তদারকিতে সাহায্য করার জন্য নুতন জীপ গাড়ি দেয়া হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী নুতন জীপ গাড়ি পেয়েছেন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মধ্যে এদের বাকি সবাইকে নুতন জীপ গাড়ি দেয়া হবে।

এ ছাড়া গত ২২ অক্টোবর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার কার্যালয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের তদারকি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০০টি মোটর সাইকেল আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করেন। অন্য তদারকি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও ক্রমান্বয়ে মোটর সাইকেল দেয়া হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

ন্যাশনাল হেলথ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম

দুর্দান্ত মনোযোগে দিনরাত ২৪ ঘন্টা

আরও দক্ষ, সুসংগঠিত

জরুরী স্বাস্থ্য সেবা সমন্বয় ও অভিযোগ নিদানে নুতন উদ্যোগ

বর্তমান সরকারের মেয়াদে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় যুগোপযোগী "ডিজিটাল হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম"। ২০১৩ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. রুহুল হক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমকে ন্যাশনাল হেলথ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমে রূপান্তর করেন। ২০১৭ সালে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এটিকে ন্যাশনাল হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম হিসেবে পুনর্গঠন করেন। প্রতিষ্ঠা অবধি এ সেন্টার দূর্যোগ, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, দুর্ঘটনা ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ এবং সংরক্ষণ করে এগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করছে। নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের পাশাপাশি দূর্যোগ কবলিত এলাকায় প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং অন্যান্য সামগ্রীর মজুদ, জনবল ইত্যাদি সুসমন্বয় করছে। এছাড়াও যে কোন সড়ক দুর্ঘটনায় (সড়ক, রেল পথ, লঞ্চ), বজ্রপাত, সর্প দংশন, পানিতে ডোবা এ ধরনের পরিস্থিতিতে আহত এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসনের মাধ্যমে নিশ্চিত করে।

এই সেন্টার প্রতিদিন মিডিয়া মনিটরিং করে থাকে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে সব সংবাদ, ঘটনা-দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় তা কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসা হয় এবং তদনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

সরকারি হাসপাতালের সেবাগ্রহীতা জনগণের মতামত ও অভিযোগ জানা এবং প্রতিকারের জন্য চালু করা হয়েছে এসএমএস-ভিত্তিক ব্যবস্থা। ৮০০টি সরকারি হাসপাতালের দেয়ালে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। এতে সহজে বলা হয়েছে কিভাবে হাসপাতালের সেবার ব্যাপারে উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে এসএমএস-এর মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে হবে। প্রতিটি এসএমএস তাৎক্ষণিক ওয়েব সাইটে দেখা যায়। কর্তৃপক্ষ প্রতিটি এসএমএস-এর বিষয়ে ব্যবস্থা নেয় এবং অভিযোগকারীকে কি ব্যবস্থা নেয়া হলো তা জানায়। এ ছাড়া একটি জাতীয় ভিত্তিক আধুনিক স্বাস্থ্য কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এই কল সেন্টারের ১৬২৬৩ নম্বর ফোনে কল করে যে কেউই দিনরাত ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে তাৎক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে, স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে পারে এবং এম্বুলেন্স ডাকতে পারে।

চিকিৎসা শিক্ষা

চিকিৎসা শিক্ষা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল (ম্যাটস) এবং ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)-র মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশদ বিবরণ "মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল" অংশে দেয়া হয়েছে।

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে ১১১টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে। সরকারি ৪২টি এবং বেসরকারি ৬৯টি। সরকারিগুলোর মধ্যে ৩৬টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং ৬টি সেনাবাহিনীর অধীনে। ৪২টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারসমূহের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৭টি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শেষ দুই মেয়াদে স্থাপিত হয়েছে ২৪টি। বঙ্গবন্ধুর আমলেও ১৯৭২ সালে দু'টি নুতন সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেসরকারি ৬৯টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনটি মেয়াদের সরকার ৩৮টির অনুমোদন দেয়। অন্য ৩১টির অনুমোদন দেয় ১৯৮৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ বহির্ভূত অন্য সকল সরকার।

সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর তথ্য "মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ এবং হাসপাতাল" অংশে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিচালিত বিভিন্ন সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর তালিকা

বঙ্গবন্ধুর আমলে স্থাপিত (২টি)

রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রংপুর (১৯৭২ সাল)
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (১৯৭২ সাল)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিন আমলে স্থাপিত (২৫টি) (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯টি + সেনাবাহিনীর অধীনে ৬টি)

২০০৯-২০১৩ সাল (৬টি)

যশোর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, যশোর (২০১০ সাল)
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সাতক্ষীরা (২০১১ সাল)

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ (২০১১ সাল)
কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুষ্টিয়া (২০১১ সাল)
শেখ সাহেরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ (২০১১ সাল)
শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গাজীপুর (২০১৩ সাল)

২০১৪-২০১৮ সাল (১৩টি)

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, টাঙ্গাইল (২০১৪ সাল)
শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ (২০১৪ সাল)
কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ (২০১৪ সাল)
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, জামালপুর (২০১৪ সাল)
পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পটুয়াখালী (২০১৪ সাল)
রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাঙ্গামাটি (২০১৪ সাল)
মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা (২০১৫ সাল)
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, হবিগঞ্জ (২০১৭ সাল)
নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নেত্রকোনা (২০১৮ সাল)
নীলফামারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নীলফামারী (২০১৮ সাল)
নওগাঁ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নওগাঁ (২০১৮ সাল)
মাগুরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মাগুরা (২০১৮ সাল)
চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চাঁদপুর (২০১৮ সাল)

সেনাবাহিনীর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (৬টি)

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ঢাকা (১৯৯৯ সাল)
আর্মি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর (২০১৪ সাল)
আর্মি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া (২০১৪ সাল)
আর্মি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম (২০১৪ সাল)
আর্মি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা (২০১৪ সাল)
আর্মি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, যশোর সেনানিবাস, যশোর (২০১৪ সাল)

এক নজরে সরকারি মেডিকেল কলেজের পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেল	১
	নুতন নির্মাণ	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ একাডেমিক ভবন ও ছাত্র এবং ছাত্রী হোস্টেল	১
		মোট	২
২০১৪-২০১৮ সাল	নুতন নির্মাণ	একাডেমিক ভবন- নোয়াখালী, কক্সবাজার, যশোর ও পাবনা মেডিকেল কলেজ	৪
		মেডিকেল কলেজের ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ- বরিশাল, পাবনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, নোয়াখালী ও কক্সবাজার	৭
		শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ	১
		মোট	১২
২০১৭-২০২২ সাল	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেল	১
		রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেল ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ এবং একাডেমিক ভবন ও ফার্মাকোলজি ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১
		এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেটের ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল	১
		শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশালের ছাত্রী হোস্টেল ও লাইব্রেরী হল রুম	১
		শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া	১
		কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও ডরমেটরী বিল্ডিং এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ	১
		খুলনা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং কলেজের সীমানা প্রাচীর, আভ্যন্তরীণ সড়ক এবং বাঙ্কার নির্মাণ	১
		দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন, ইন্টার্নী ডাক্তারদের হোস্টেল ও ডরমেটরীর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং অডিটোরিয়াম ভবন তৈরির অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরণ	১
	নুতন নির্মাণ	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ- একাডেমিক ভবন, ছাত্রী হোস্টেলের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, পুরুষ নার্স হোস্টেল	১
		রংপুর মেডিকেল কলেজ- মাইক্রোবায়োলজি লেকচার হল, ব্রাদার'স হোস্টেল বিল্ডিং-এর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ, স্নাতকোত্তর চিকিৎসকদের জন্য ডরমেটরী ভবন নির্মাণ, কলেজ অডিটোরিয়াম নির্মাণ	১
		পাবনা মেডিকেল কলেজে ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ	১
	সম্পন্নকরণ	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ- উন্নয়ন কাজের অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন	১
		মোট	১২
চলমান প্রকল্প	নুতন নির্মাণ	মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১
		শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর	১
		শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাংগাইল	১
		শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	১
		মোট	৪
		সর্বমোট	৩০

ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে ৩৬টি ডেন্টাল কলেজ, ডেন্টাল ইউনিট ও হাসপাতাল রয়েছে। সরকারি ৯টি (১টি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিট) এবং বেসরকারি ২৭টি। সরকারি ৯টি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে (২০০৯-২০১৩ সাল) প্রতিষ্ঠিত হয় ৬টি। স্বাধীনতাপূর্বকাল থেকেই ছিল ১টি। অন্য সরকারের আমলে স্থাপিত হয় ২টি। বেসরকারি ২৭টি ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনটি মেয়াদের সরকার ২২টির অনুমোদন দেয়। অন্য ৫টির অনুমোদন দেয় ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ বহির্ভূত অন্য সরকারগুলো। সরকারি-বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, ইউনিটগুলোর তথ্য "মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ এবং হাসপাতাল" অংশে দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডেন্টাল ইউনিট ও হাসপাতালগুলোর তালিকা

২০০৯-২০১৩ সাল (৬টি)

- শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (২০১২ সাল)
- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা (২০১২ সাল)
- ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট, ময়মনসিংহ (২০১২ সাল)
- এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট, সিলেট (২০১২ সাল)
- শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট, বরিশাল (২০১২ সাল)
- রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট, রংপুর (২০১২ সাল)

স্বাধীনতাপূর্বকালে স্থাপিত (১টি)

- ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা (১৯৬০ সাল)

অন্যান্য সরকারের আমলে স্থাপিত (২টি)

- রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট, রাজশাহী (১৯৮৯ সাল)
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট, চট্টগ্রাম (১৯৯০ সাল)

এক নজরে সরকারি ডেন্টাল কলেজের পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০১৪-২০১৮ সাল	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ	১
২০১৭-২০২২ সাল	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল	১
চলমান প্রকল্প	নুতন নির্মাণ	শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ	১
		মোট	৩

নার্সিং/ মিডওয়াইফারি কলেজ ও ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে ৩১৭টি নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট রয়েছে। সরকারি ৯৯টি এবং বেসরকারি ২১৮টি। ৯৯টি সরকারি নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৯টি। ২০০৯-২০১৩ সালে ১৬টি এবং ২০১৪-২০১৮ সালে ৪৩টি। ২০০৯ পূর্ববর্তিকালে ছিল ৪০টি। সারণী দ্রষ্টব্য।

২১৮টি বেসরকারি নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের মধ্যে শেখ হাসিনার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪টি। ২০০৯-২০১৩ সালে ৫২টি এবং ২০১৪-২০১৮ সালে ১৩২টি। ২০০৯ পূর্বকাল থেকে ছিল ৩৪টি। সারণী দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটের সংখ্যা

নার্সিং প্রতিষ্ঠান	২০০৯ পূর্বকালে	শেখ হাসিনার সরকার			সর্বমোট
		২০০৯-২০১৩ সাল	২০১৪-২০১৮ সাল	মোট	
সরকারি					
নার্সিং কলেজ	৫	৮	৫	১৩	১৮
নার্সিং ইনস্টিটিউট	৩৫	৮	০	৮	৪৩
নার্সিং (ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি) ইনস্টিটিউট	০	০	৩৮	৩৮	৩৮
মোট	৪০	১৬	৪৩	৫৯	৯৯
বেসরকারি					
নার্সিং কলেজ	৪	১৯	২২	৪১	৪৫
নার্সিং ইনস্টিটিউট	২০	২৭	৯৩	১২০	১৪০
বেসরকারি (১ বছরের বিশেষায়িত কোর্স) নার্সিং প্রতিষ্ঠান	২	২	০	২	৪
নার্সিং (ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি) ইনস্টিটিউট	০	০	১৬	১৬	১৬
বেসরকারি জুনিয়র মিডওয়াইফারি (১৮ মাস কোর্স) ইনস্টিটিউট	৮	৪	১	৫	১৩
মোট	৩৪	৫২	১৩২	১৮৪	২১৮
সর্বমোট	৭৪	৬৮	১৭৫	২৪৩	৩১৭

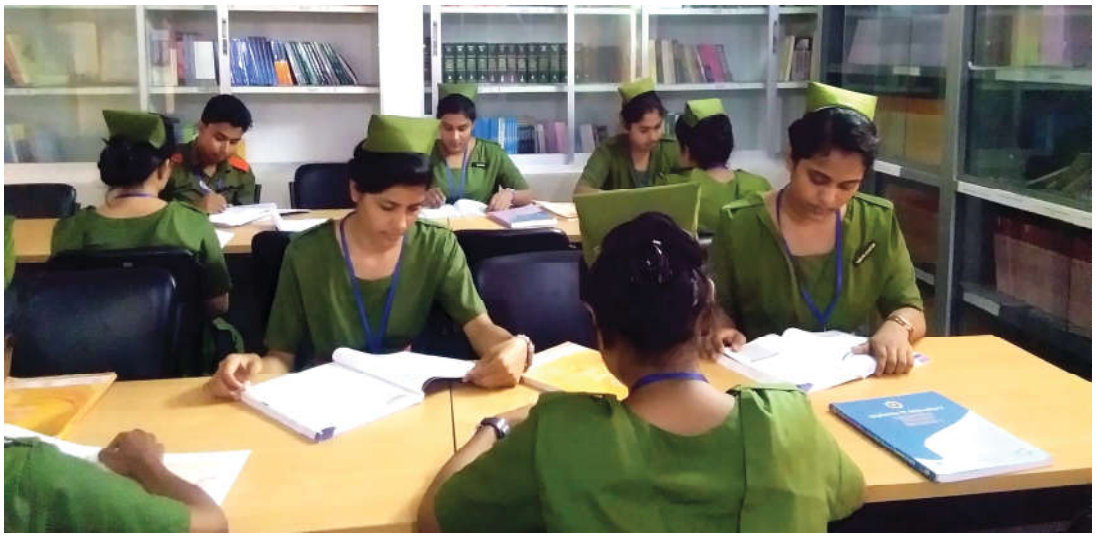

এক নজরে সরকারি নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০১৪-২০১৮ সাল	নুতন নির্মাণ	গাজীপুর	১
২০১৭-২০২২ সাল	নুতন নির্মাণ	সুনামগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী ও পাবনা	৬
		কুড়িগ্রাম	১
		নার্সিং ইনস্টিটিউট	২
	সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	নার্সিং ইনস্টিটিউট পুনর্গঠন ও সংস্কার	২৫
	সম্পন্নকরণ	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভবন, মহাখালীর অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরণ	১
		মোট	৩৫
চলমান প্রকল্প	নুতন নির্মাণ	পাবনা	১
	সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	এক্সপানসন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন, ঢাকা	১
		মোট	২
		সর্বমোট	৩৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত আগ্রহে নিরাপদ মাতৃত্ব ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে মিডওয়াইফারি নামের নুতন পেশা

মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল (ম্যাটস)

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে ২০৯টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল (ম্যাটস) রয়েছে। সরকারি ৯টি এবং বেসরকারি ২০০টি। ৯টি সরকারি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল (ম্যাটস)-এর মধ্যে ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ৮টি। ২০০৯-২০১৮ সালে শেখ হাসিনার আমলে হয় ১টি। সারণী দ্রষ্টব্য। ২০০টি বেসরকারি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল (ম্যাটস)-এর মধ্যে শেখ হাসিনার আমলে ২০০৯-২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮টি। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ২২টি বেসরকারি ম্যাটস। সারণী দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশে মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল (ম্যাটস)-এর সংখ্যা

সরকার	প্রতিষ্ঠাকাল	সরকারি	বেসরকারি	মোট
শেখ হাসিনার সরকার	২০০৯-২০১৩ সাল	-	১১৮	১১৮
	২০১৪-২০১৮ সাল	১	৬০	৬১
	মোট	১	১৭৮	১৭৯
অন্য সরকার	১৯৭৬-১৯৮০ সাল	৭	-	৭
	১৯৯১ সাল	১	-	১
	২০০৮ সাল	-	২২	-
	মোট	৮	২২	৩০
	সর্বমোট	৯	২০০	২০৯

এক নজরে সরকারি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল (ম্যাটস)-এর পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০১৪-২০১৮ সাল	নুতন নির্মাণ	গাজীপুর	১
২০১৭-২০২২ সাল	নুতন নির্মাণ	নুতন	৯
		মোট	১০

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে ১০৫টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) রয়েছে। সরকারি ১১টি এবং বেসরকারি ৯৪টি। ১১টি সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)-র মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় ৮টি। ১৯৬২ সালে হয় ২টি। ২০০২-২০০৮ সালের মধ্যে হয় ১টি। সারণী দ্রষ্টব্য।

৯৪টি বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)-র মধ্যে শেখ হাসিনার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৭টি। ২০০২-২০০৮ সালে ৩৭টি। স্বাধীনতা পূর্বকালে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল না।। সারণী দ্রষ্টব্য।

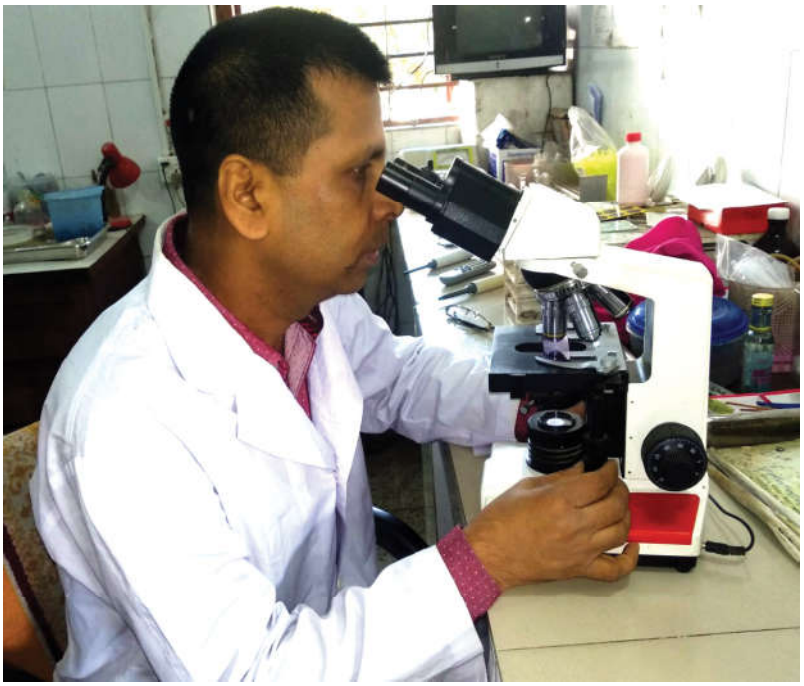

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট একজন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দানকারী। বাংলাদেশ এই পেশার জনবলের ঘাটতি পূরণে যত্নবান।

বাংলাদেশে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)-র সংখ্যা

সরকার	প্রতিষ্ঠাকাল	সরকারি	বেসরকারি	মোট
স্বাধীনতা পূর্বকাল	১৯৬২ সাল	২	-	২
শেখ হাসিনার সরকার	১৯৯৬-২০০১ সাল	-	১	১
	২০০৯-২০১৩ সাল	৫	৪৪	৪৯
	২০১৪-২০১৮ সাল	৩	১২	১৫
	মোট	৮	৫৭	৬৫
অন্য সরকার	২০০২-২০০৮ সাল	১	৩৭	৩৮
	সর্বমোট	১১	৯৪	১০৫

এক নজরে সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)-র পূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রকল্পের মেয়াদ	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ	সংখ্যা
২০০৯-২০১৩ সাল	নুতন নির্মাণ	সিলেট	১
২০১৪-২০১৮ সাল	নুতন নির্মাণ	জামালপুর ও গাজীপুর	২
২০১৭-২০২২ সাল	নুতন নির্মাণ	নুতন আইএইচটি প্রতিষ্ঠা	১১
		অধ্যক্ষের কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার ও ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল	১
	মোট		১২
	সর্বমোট		১৫

আসন সংখ্যা বৃদ্ধি

মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০০৯-২০১৩ সাল	২০১৪-২০১৮ সাল	২০০৯-২০১৮ সাল
সরকারি মেডিকেল কলেজ	৬৫২	১,২৫৬	১,৫৪৪
বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	২,৩১০	১,০০১	৩,২১১
আর্মড ফোর্সেস/ আর্মি মেডিকেল কলেজ	০	৩০৫	৩০৫
মোট	২,৯৬২	২,৫৬২	৫,৫২৪

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০০৯-২০১৩ সাল	২০১৪-২০১৮ সাল	২০০৯-২০১৮ সাল
সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৩২৭	০	৩২৭
বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	৩০৫	১৪০	৪৪৫
বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট	১৮৫	২০০	৩৮৫
মোট	৮১৭	৩৪০	১,১৫৭

নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটসমূহের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০০৯-২০১৩ সাল	২০১৪-২০১৮ সাল	২০০৯-২০১৮ সাল
সরকারি নার্সিং কলেজ	৯১০	১৫০	১,০৬০
সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	১,৩০৫	-	১,৩০৫
সরকারি নার্সিং (ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি) ইনস্টিটিউট	-	৯৭৫	৯৭৫
মোট	২,২১৫	১,১২৫	৩,৩৪০
বেসরকারি নার্সিং কলেজ	৭০৫	২,৭৭৫	৩,৪৮০
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	১,৩৮০	৫,১২৫	৬,৫০৫
বেসরকারি (১ বছরের বিশেষায়িত কোর্স) নার্সিং প্রতিষ্ঠান	৪০	-	৪০
বেসরকারি নার্সিং (ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি) ইনস্টিটিউট	-	৫৬০	৫৬০
বেসরকারি জুনিয়র মিডওয়াইফারি (১৮ মাস কোর্স) ইনস্টিটিউট	১৮০	৪০	২২০
মোট	২,৩০৫	৮,৫০০	১০,৮০৫
সর্বমোট	৪,৫২০	৯,৬২৫	১৪,১৪৫

মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল (ম্যাটস)-সমূহের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০০৯-২০১৩ সাল	২০১৪-২০১৮ সাল	২০০৯-২০১৮ সাল
সরকারি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল	৬৬	৫২	১১৮
বেসরকারি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেইনিং স্কুল	৩,০১৫	৮,৬৭০	১১,৬৮৫
মোট	৩,০৮১	৮,৭২২	১১,৮০৩

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)-সমূহের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০০৯-২০১৩ সাল	২০১৪-২০১৮ সাল	২০০৯-২০১৮ সাল
সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি	১,৪০৯	১৬৬	১,৫৭৫
বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি	৪,২৮৫	-১,২৯১	২,৯৯৪
মোট	৫,৬৯৪	-১,১২৫	৪,৫৬৯

স্বাস্থ্য জনবল বৃদ্ধি ও প্রণোদনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুধাবন করেন দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক প্রয়োজন। তিনি অনুধাবন করেন ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের জন্য আরও সরকারি চিকিৎসক দরকার। তিনি আরও অনুধাবন করেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য জনবল না বাড়ালে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা যাবে না। কাজেই তিনি চিকিৎসকদের শুন্যপদগুলো পূরণের যেমন চেষ্টা করছেন তেমনি চিকিৎসকের হাজার হাজার নুতন পদ সৃষ্টির প্রয়াস নিচ্ছেন। সম্প্রতি তিনি ১০ হাজার নুতন পদ সৃষ্টি করে বাড়তি চিকিৎসক নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন। একইভাবে তিনি নার্স জনশক্তির পদ বাড়িয়েছেন ১৫ হাজার এবং সেগুলোতে নুতন নার্স নিয়োগ দিয়েছেন। নার্সদের উৎসাহ দেয়ার জন্য এবং সমাজে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য তিনি সরকারি নার্সদের পদবী ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতৃস্বাস্থ্য ও নবজাতকের স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ৩ হাজার মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টি করেছেন। মিডওয়াইফ পেশাটি কেবল উন্নত দেশগুলোতে ছিল। বাংলাদেশে এই পেশাটি ছিলই না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে জাতিসংঘে ঘোষণা দেন যে, তিনি ২০১৫ সালের মধ্যেই অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ঠের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশে এই পদ সৃষ্টি করবেন। ইউএনএফপিএ-কে ধন্যবাদ বাংলাদেশকে সংস্থাটি এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশে এ বিষয়ে কোন শিক্ষা কোর্স ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে বাংলাদেশে বিশ্বমানের মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। নুতন পদ সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে পাশকৃত ১,২০০ জন মিডওয়াইফকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হয়ছে। অন্যান্য সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর শুন্যপদগুলো পূরণ করা হয়েছে এবং নুতন নুতন পদ সৃষ্টি হয়েছে । পরবর্তী পৃষ্ঠায় সারণীগুলোতে বিভিন্ন স্বাস্থ্যপেশায় জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অন্যান্য প্রণোদনার বিবরণ দেয়া হলো । বর্তমানে ১০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান। অন্যান্য সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর শুন্য পদগুলোও পূরণ করা হয়েছে এবং নুতন নুতন পদ সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্স জনশক্তির পদ বাড়িয়েছেন ১৫ হাজার। সেগুলোতে তিনি নুতন নার্স নিয়োগ দিয়েছেন। নার্সদের উৎসাহ দেয়ার জন্য এবং সমাজে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য তিনি সরকারি নার্সদের পদবী ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করেছেন।

দশ বছরে চিকিৎসক নিয়োগ হয়েছে সাড়ে ১৫ হাজার

সাল	বিসিএস	সংখ্যা	এডহক	মোট
২০০৯	২৭	১,৫১৮	৩,৫৫১	৫,০৬৯
২০১০	২৮	৮০৩	০	৮০৩
২০১১	২৯	২১২	৫৮২	৭৯৪
২০১২	৩০	৫৬৮	০	৫৬৮
২০১২	৩১	৩৬০	০	৩৬০
২০১৩	৩২	৬০৮	০	৬০৮
মোট		৪,০৬৯	৪,১৩৩	৮,২০২
২০১৪	৩৩	৬,২৩৫	০	৬,২৩৫
২০১৫	০	০	০	০
২০১৬	৩৪	২২০	০	২২০
২০১৭	৩৫	৪৪৪	০	৪৪৪
২০১৮	৩৬	১৮০	০	১৮০
মোট		৭,০৭৯	০	৭,০৭৯
সর্বমোট		১১,১৪৮	৪,১৩৩	১৫,২৮১

যে কোন দেশেই স্বাস্থ্যসেবা পরিচালিত হয় চিকিৎসকদের মাধ্যমে। আগে চিকিৎসকদের পদোন্নতি হতো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। বিষয়টি খুবই সময় সাপেক্ষ ছিল। এতে চিকিৎসকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তো দীর্ঘকাল প্রাপ্য পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে। অন্যদিকে বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর অধিকাংশই শুন্য থাকতো দীর্ঘকাল। প্রশাসনিক পদগুলোতেও একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর এ বিষয়টিতে মনোযোগী হন। ফলে ২০১২ সাল থেকে ডিপার্টমেন্টাল পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক; জুনিয়র ও সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং সহকারী পরিচালক ও উপপরিচালক পদে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই পদোন্নতির পদ্ধতি শুরু হয়। হতাশার জায়গা দখল করেছে উত্তরোত্তর প্রত্যাশা। সিনিয়র পদ যেমন অধ্যাপক ও পরিচালক পদে পদোন্নতির পদ্ধতি হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত সিনিয়র সার্ভিস বোর্ড কর্তৃক।

এর ফলে চিকিৎসকদের পদোন্নতিতে গতিশীলতার সৃষ্টি হয় এবং তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত বেদনার অবসান হয়। অপরদিকে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলোতে দক্ষ ও সিনিয়র চিকিৎসকের শুন্যতা সৃষ্টির অবকাশ চিরতরের জন্য বিলুপ্ত হয়।

অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে বছরওয়ারী পদোন্নতি (২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত)

সাল	অধ্যাপক	সহযোগী অধ্যাপক	সহকারী অধ্যাপক	মোট
২০০৯-১০	২০১১ সালের পূর্বে পিএসসি কর্তৃক পদোন্নতি প্রদান করা হতো।			
২০১০-১১				
২০১১-১২	০	১৪২	৬৪২	৭৮৪
২০১২-১৩	০	৪২	৬৬	১০৮
২০১৩-১৪	১১৭	৬১৪	১,০১১	১,৭৪২
মোট	১১৭	৭৯৮	১,৭১৯	২,৬৩৪
২০১৪-১৫	১২২	০	০	১২২
২০১৫-১৬	১৩০	৩৫৬	৫৩৮	১০২৪
২০১৬-১৭	১৪৩	০	৪৯৯	৬৪২
২০১৭-১৮	১২৭	৫৪৩	০	৬৭০
মোট	৫২২	৮৯৯	১,০৩৭	২,৪৫৮
সর্বমোট	৬৩৯	১,৬৯৭	২,৭৫৬	৫,০৯২

দশ বছরে ক্লিনিক্যাল ও প্রশাসনিক পদে পদোন্নতি হয়েছে প্রায় ছয় হাজার

সাল	সিনিয়র কনসালটেন্ট	জুনিয়র কনসালটেন্ট	পরিচালক	উপপরিচালক	সহকারী পরিচালক	মোট
২০০৯	১৫	০	০	২৯	৫১	৯৫
২০১০	০	০	০	৬৫	৭৭	১৪২
২০১১	১১৩	১৩	০	০	১০৪	২৩০
২০১২	৮৬	৬৩১	০	৩২	১৫০	৮৯৯
২০১৩	১৪৫	১,৩৮১	২৬	৬৭	১০৮	১,৭২৭
মোট	৩৫৯	২,০২৫	২৬	১৯৩	৪৯০	৩,০৯৩
২০১৪	১৪২	০	১	৭৭	৭৫	২৯৫
২০১৫	০	৫৯৭	০	৬৩	১৫৮	৮১৮
২০১৬	৩২৭	০	৯	২৯	৮৮	৪৫৩
২০১৭	০	৭৩৬	২৮	১০২	২৬৮	১,১৩৪
২০১৮	০	০	১৪	০	০	১৪
মোট	৪৬৯	১,৩৩৩	৫২	২৭১	৫৮৯	২,৭১৪
সর্বমোট	৮২৮	৩,৩৫৮	৭৮	৪৬৪	১,০৭৯	৫,৮০৭

সিনিয়র স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান এবং স্থায়ীকরণ ও নিয়মিতকরণ হয়েছে ২৯ সহস্রাধিক

সাল	সিনিয়র স্কেল	সিলেকশন গ্রেড	স্থায়ীকরণ	নিয়মিতকরণ	মোট
২০০৯	১৭৫	৬৯৩	৪১২	০	১,২৮০
২০১০	০	২৮০	৭২৩	০	১,০০৩
২০১১	৯৬২	০	১,৩৮২	০	২,৩৪৪
২০১২	০	২,২৫৫	১,৩০৯	০	৩,৫৬৪
২০১৩	৩২৯	২,৯০৪	৭৯৪	০	৪,০২৭
মোট	১,৪৬৬	৬,১৩২	৪,৬২০	০	১২,২১৮
২০১৪	৩০৭	১,৮৯৭	৪০০	০	২,৬০৪
২০১৫	২৯৩	২,৯৩৮	১,৫১৯	৫৬৪	৫,৩১৪
২০১৬	০	১,৫৭৬	২,৫৮০	১,০৩৭	৫,১৯৩
২০১৭	৫০৭	০	২,১৬৬	১২৩	২,৭৯৬
২০১৮	০	০	১,০৯৩	৪৪	১,১৩৭
মোট	১,১০৭	৬,৪১১	৭,৭৫৮	১,৭৬৮	১৭,০৪৪
সর্বমোট	২,৫৭৩	১২,৫৪৩	১২,৩৭৮	১,৭৬৮	২৯,২৬২

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা

মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর	অনুমোদিত পদ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৭৩
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১০০,৭৫৭
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৫২,২৪৮
জাতীয় জনসংখ্যা ও গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮১৫
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৩৭০
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি)	৬১৯
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৩২,২০০
ন্যাশনাল ইলেক্ট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট	৯৫
টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স অর্গানাইজেশন (টেমো)	৭৫
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	২৯
মোট	১৮৭,৫৮১

প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন

চাকুরীতে নিয়োগের পর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অব্যাহতভাবে দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিটি অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। নীচে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইন-সার্ভিস ট্রেইনিং শাখা আয়োজিত বিভিন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দেয়া হলো।

২০১১-২০১৮ মেয়াদে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইন-সার্ভিস ট্রেইনিং শাখা প্রশিক্ষণ দিয়েছে দুই লক্ষাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে

অর্থ বছর	ব্যাচ সংখ্যা	ব্যাচ প্রতি অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২০১১-১২	৮৩০	২৫	২০,৭৫০
২০১২-১৩	১,২৪৪	২৫	৩১,১০০
২০১৩-১৪	১,২১৪	২৫	৩০,৩৫০
২০১৪-১৫	৯৬৭	২৫	২৪,১৭৫
২০১৫-১৬	২,২৩৩	২৫	৫৫,৮২৫
২০১৬-১৭	২২৬	২৫	৫,৬৫০
২০১৭-১৮	১,২৮৭	২৫	৩২,১৭৫
মোট	৮,০০১		২০০,০২৫

মেডিকেল এডুকেশন ও এইচএমডির অধীনে মোট ১,০৫৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উন্নত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও আইএসটি এর অধীনে সর্বমোট ২০০,০২৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উন্নত দেশীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ৮ বছরে বিদেশে ১,০৫৬ জন কর্মকর্তাকে উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; এশিয়া আমেরিকার ৯ টি দেশ ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও আমেরিকায়। ক্লিনিক্যাল বিষয়ের উপর এই সমস্ত প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্যখাতে কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে তুলতে ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) এর পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স ও জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ (জেএইচএসপিএইচ) এর তত্ত্বাবধানে এবং ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে ডিজিএইচএস, বিএসএমএমইউ, জেএইচএসপিএইচ এবং ইউনিসেফের মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হয়েছে, যা জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে কৌশলগত নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোর্সের বর্তমান সংস্করণ বাড়ানোর জন্য একত্রে কাজ শুরু করে। এর আওতায় ২০১৮ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডাইরেক্টর এবং লাইন ডাইরেক্টরদের ৩ দিনব্যাপি 'এক্সিকিউটিভ লিডারশিপ' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- ৯৫টি পোস্ট গ্রাজুয়েট বিষয় চলমান। এর মধ্যে ৬২টি হলো রেসিডেন্সী কোর্স।
- ৪ বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং কোর্স চালু।
- দেশে প্রথমবারের মতো এমএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু।
- অটিজমের উপর কোইকা ফেলোশিপ কর্মসূচির ৫ দিনব্যাপী প্রিপারেটরি কোর্স চালু।
- ডিএনএ প্রোফাইলিং থেকে শুরু করে এন্ডোভাস্কুলার সার্জারী এবং এওরটিক সার্জারীর উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মেডিকেল এডুকেশন ও এইচএমডির অধীনে মোট ১,০৫৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উন্নত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আইএসটি এর অধীনে সর্বমোট ২০০,০২৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উন্নত দেশীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

জনস্বাস্থ্যে বিস্ময়কর উন্নয়ন

(মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচার কর্মসূচি)

মাতৃস্বাস্থ্য

সরকার মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে নিম্নলিখিত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে

- **মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমঃ** হতদরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকল্পে ৫৫টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে তা ১৩২টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। এর আওতায় দরিদ্র মায়েদের প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী যাবতীয় সেবা, যাতায়াত খরচ এবং পুষ্টিকর খাবারসহ যাবতীয় খরচ বহনের জন্য সরকার অর্থ প্রদান করে। ২০০৯ থেকে ২০১৭ সময়কালে উপকারভোগী মায়ের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৭৫ জন।
- **কমিউনিটি স্কীলড বার্থ এটেন্ডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণঃ** সচেতনতার অভাবে অনেক প্রসূতি মায়ের প্রসব এখনও বাড়িতেই করানো হয় যদিও সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সন্তান জন্মদানকে উৎসাহিত করে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতিতে যাতে বাড়িতেও সন্তান প্রসব করানো যায় সেজন্য কমিউনিটি স্কীলড বার্থ এটেন্ডেন্ট (সিএসবিএ) তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে কর্মরত নারী কর্মীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১২,৪৮০ জন কর্মীকে এ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণঃ** উন্নত দেশগুলোতে মিডওয়াইফ নামে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য পেশাজীবী শ্রেণী মাতৃস্বাস্থ্য এবং ছোট শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই ধরণের পেশাজীবী এবং প্রশিক্ষণ কোর্স ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে জাতিসংঘে প্রতিশ্রুতি দেন যে,

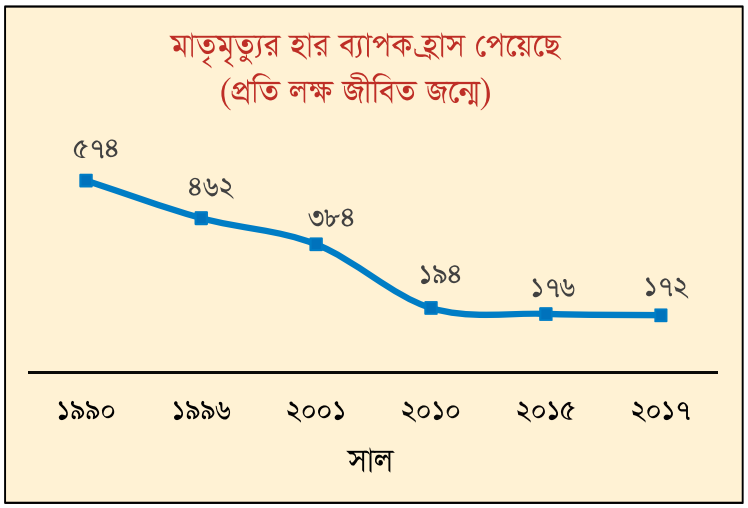

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যা
শুভ উদ্বোধন
প্রধান অতিথি
শেখ হাসিনা
২০১৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সর
পরিবার কল্যাণ

বাংলাদেশেও এ ধরণের পেশাজীবী তৈরি করবেন। তদানুযায়ী স্বল্পকালীন লক্ষ্য হিসেবে সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ৬ মাসের মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ৩,০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১,২০০ মিডওয়াইফকে পদায়ন করা হয়েছে।

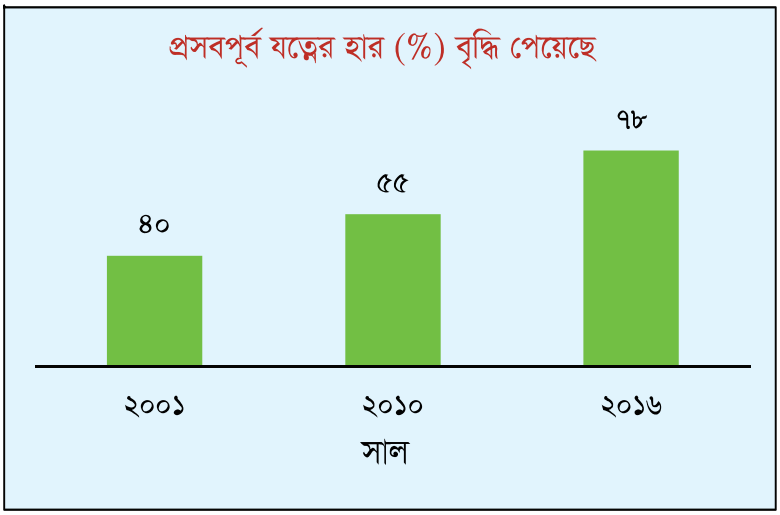

- **প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ প্রতিরোধকরণঃ** বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ। এ জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অক্সিটোসিন ইনজেকশন এবং মিজোপ্রস্টল বড়ি সরবরাহ করা হচ্ছে। যে সব গর্ভবতী মহিলার প্রসব বাড়িতে হয় তাদের জন্যও স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাড়িতেই মিজোপ্রস্টল বড়ি সরবরাহ করা হচ্ছে।
- **অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ রোধঃ** অনেকেই অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ করে। তারা এ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। অনেকের নানা কারণে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত হয়ে থাকে। জটিলতাও হয়। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে ১৩৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ঋতু নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত পরবর্তী যত্ন এবং অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া হচ্ছে।
- **মেটারনাল এন্ড পেরিনেটাল ডেথ রিভিউ এন্ড সার্ভিলেন্সঃ** মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করার জন্য এসব মৃত্যুর কারণ জানা দরকার। এ জন্য ২২ টি জেলায় মেটারনাল এন্ড পেরিনেটাল ডেথ রিভিউ এন্ড সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- **কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ প্রসব সেবাঃ** ৫ সহস্রাধিক কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ প্রসব সেবা চালু করা হয়েছে। এ ধরণের কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বাড়ানো হচ্ছে।

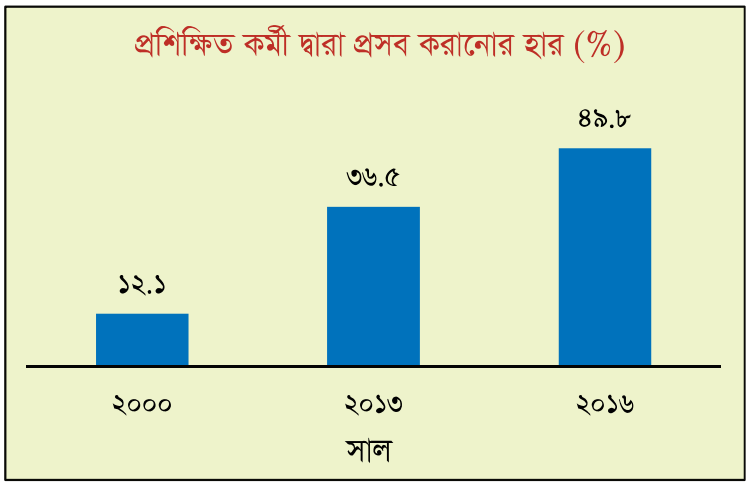

- **অব্‌সটেট্রিক ফিস্টুলা রিপেয়ার কার্যক্রমঃ** ১৪টি হাসপাতালে অব্‌সটেট্রিক ফিস্টুলা রিপেয়ার কার্যক্রম চলছে।
- **সারভাইক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং কার্যক্রমঃ** সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৭টি জেলা হাসপাতাল এবং ১২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সারভাইক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- **মাতৃস্বাস্থ্য জাতীয় কৌশলপত্রঃ** মাতৃস্বাস্থ্যের উপর জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন, প্রসব পরবর্তী, নবজাতকের স্বাস্থ্য এবং জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রমের প্রটোকল চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- **নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ১৯৯৭ সালে বার্ষিক ভিত্তিতে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালনের ঘোষনা দেন। তদানুযায়ী প্রতি বছর ২৮ মে জাতীয়ভাবে "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস" পালন করা হয়।

শিশুস্বাস্থ্য

শিশু বয়সকালের সম্বন্বিত চিকিৎসা সেবা কর্নার (আইএমসিআই) ও পুষ্টি কর্নার কার্যক্রম

- সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- ৫৯টি জেলা হাসপাতাল
- সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ন্যাশনাল নিওনেটাল হেলথ প্রোগ্রাম (এনএনএইচপি) ও আইএমসিআই কার্যক্রমসমূহ

- নবজাতকের নাভিতে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন ব্যবহার
- ৪৩টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে SCANU (স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট) স্থাপন
- সব জেলায় Helping Babies Breathe (এইচবিবি) কর্মসূচি সম্প্রসারণ
- প্রায় ১০০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার চালুকরণ

ন্যাশনাল নিওনেটাল হেলথ প্রোগ্রাম (এনএনএইচপি) ও আইএমসিআই কার্যক্রমসমূহ জোরদার করার বিভিন্ন পদক্ষেপ

- সঠিক এবং কার্যকর রেফারেল সিস্টেম
- ডাক্তার এবং নার্সদের দক্ষতাবৃদ্ধি
- দক্ষ স্বাস্থ্য সেবক সৃষ্টি
- ঔষধ এবং লজিস্টিক সরবরাহ
- জনসম্পৃক্ততা ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি

শিশুদের জীবন রক্ষায় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে ১৯৭৮ সালে যা লক্ষ লক্ষ শিশুকে পঙ্গুত্ব ও অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে।

অনূর্ধ্ব ৫ শিশু মৃত্যুর হার ২০০৮ সালের তুলনায় ৪২% কমেছে (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)

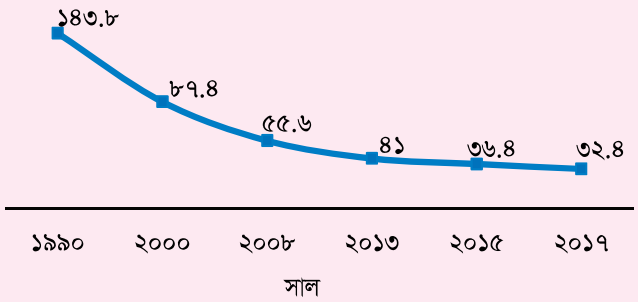

অনূর্ধ্ব ১ শিশু মৃত্যুর হার ২০০৮ সালের তুলনায় ৩৮% কমেছে (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)

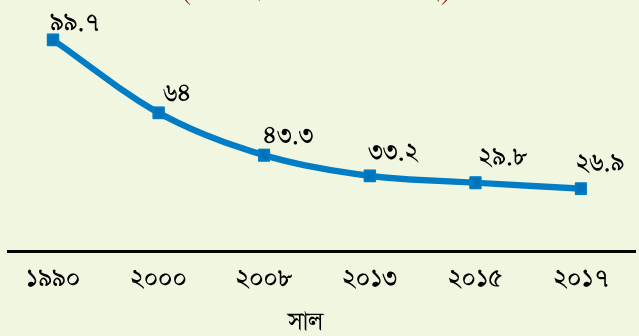

নবজাতকের মৃত্যুর হার ২০০৮ সালের তুলনায় ৪০% কমেছে (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)

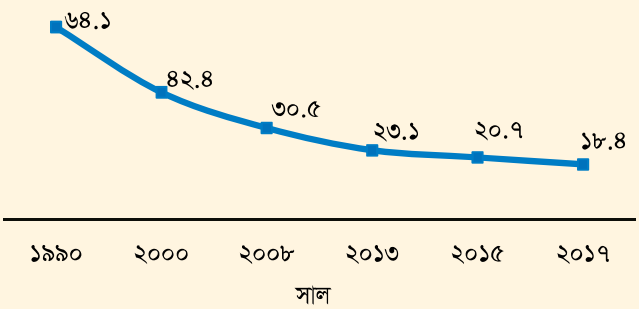

শিশুদের মধ্যে ডিপিটি (১২-২৩ মাস), হেপ-বি (১২ মাস) ও হাম (১২-২৩ মাস) টিকাদানের হার (%)

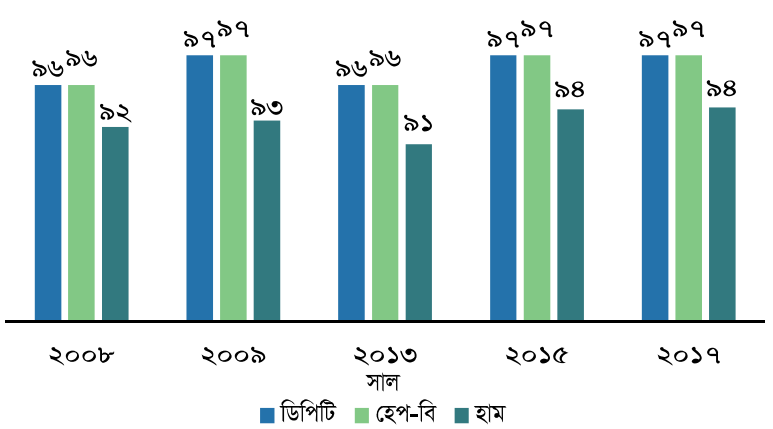

- ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রচলিত ৭টি টিকার (বিসিজি, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পোলিও, হুপিং কাশি, হাম ও হেপাটাইটিস-বি) সাথে আরও ৪টি টিকা (হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম ও রুবেলা, নিউমোক্কাল নিউমোনিয়া ও ফ্রাকশনাল আইপিভি) সংযুক্ত হয়।
- ২০১৪ সালের ২৭ মার্চ বাংলাদেশ থেকে পোলিও নির্মূল হয়েছে বলে ঘোষণা দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এটি নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যখাতে একটি বিরাট অর্জন। এই সাফল্য এসেছে ইপিআই কার্যক্রমের মাধ্যমে।

পুষ্টিসেবা

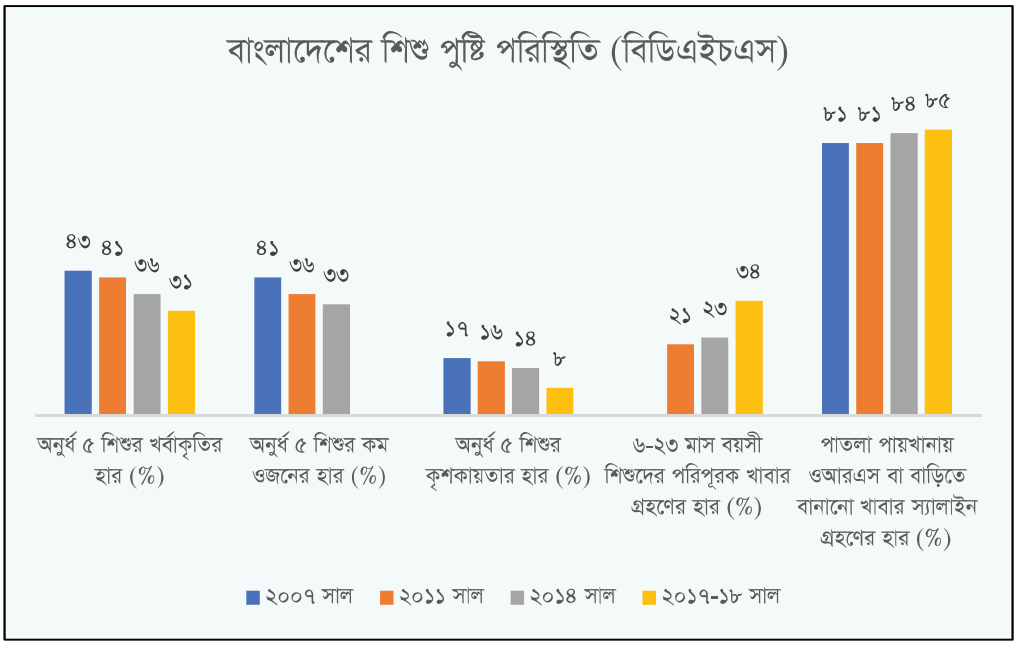

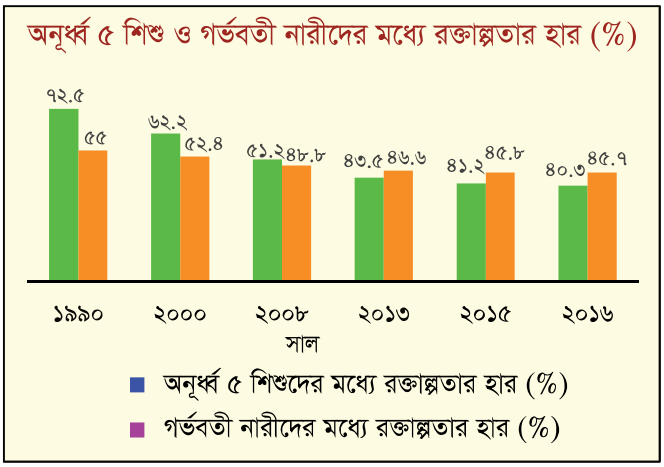

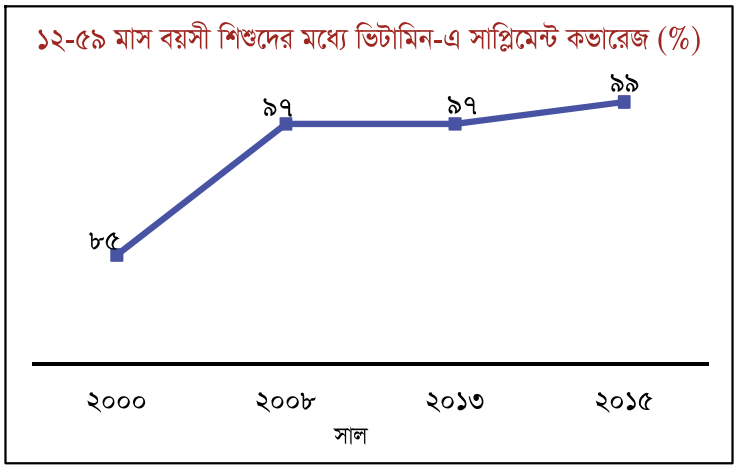

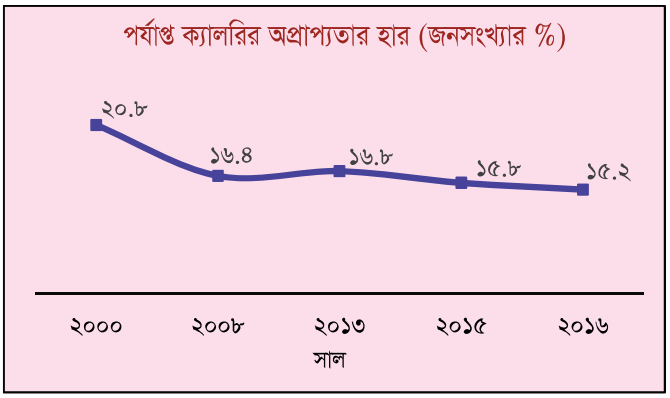

সরকারের দৃঢ় চিত্ত এবং কার্যকর ও শক্তিশালী পুষ্টি কর্মসূচির কারণে বাংলাদেশের শিশু, নারী ও সার্বিকভাবে জাতীয় পুষ্টি পরিস্থিতি লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি কার্যক্রমকে মূলধারায় নিয়ে আসা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ অবশ্যই পুষ্টি সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে দৃঢ় সংকল্প।

বাংলাদেশ ২য় জাতীয় পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেই পথে এগিয়ে যাবে।

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ

- বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে সংক্রামক রোগ উচ্ছেদ (Eradication), নির্মূল (Elimination) ও নিয়ন্ত্রণ (Control)-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।
- জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি এমন বিভিন্ন সংক্রামক রোগ নির্মূল করা হয়েছে। আরো কিছু রোগ নির্মূলের জন্য অপেক্ষমান।
- বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এগারোটি দেশকে ২৭ মার্চ ২০১৪ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পোলিও মুক্ত দেশের সনদ দিয়েছে।

ফাইলেরিয়া রোগের প্রাক-নির্মূল

ফাইলেরিয়া রোগের প্রাক-নির্মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। ২০০৯ সালে ১৯টি জেলা ফাইলেরিয়া প্রবণ ছিল। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ছিল প্রায় ৩৬ লক্ষ। ২০১৫ সালে দেশ পুরোটাই ফাইলেরিয়া ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে। এখন ফাইলেরিয়া অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা শুন্য। আমরা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ফাইলেরিয়া মুক্ত সনদের জন্য অপেক্ষমান।

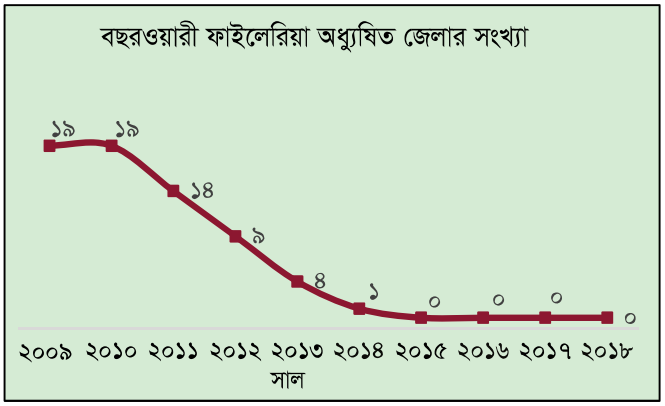

ম্যালেরিয়াঃ নিয়ন্ত্রণ হতে নির্মূলের পথে

- ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ৬৫% এবং ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যু ৯২% কমেছে।
- ম্যালেরিয়াপ্রবণ ৮টি জেলায় গত এক দশকে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৯৯%।
- ২০১৭ সালে মোট রোগীর প্রায় ৮৫%-কে মাঠ পর্যায়েই সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৭ সালে মারাত্মক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ২.৩%।
- সম্প্রতি একটি ম্যালেরিয়া হটলাইন নম্বর (০১৭৮৭৬৯১৩৭০) চালু করা হয়েছে।

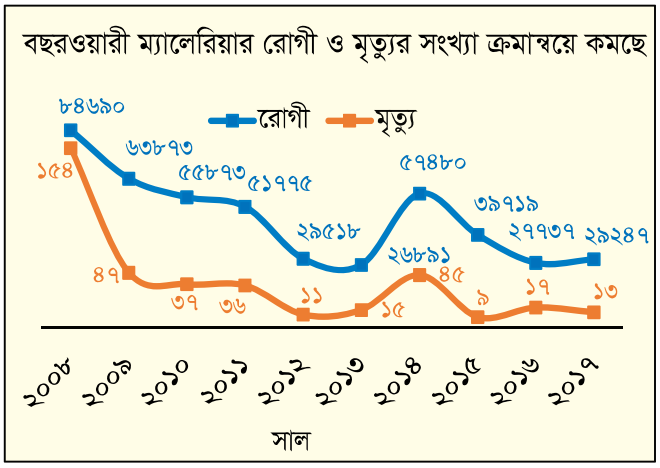

কালাজ্বর নির্মূলে সাফল্য

- লক্ষ্য ছিল ২০১৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে কালাজ্বর নির্মূল করা। কিন্তু, ২০১৬ সালেই তা অর্জিত হয়েছে।
- ২০০৯ সালে কালাজ্বরের রোগী ছিল প্রায় ৪,২৯৩ জন। ২০১৭ সালে তা হয়েছিল ৩৭৬ জন। ২০১৮ সালে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৯০ জন। ১০০% উপজেলায় কালাজ্বর নির্মূল অর্জিত হয়েছে।

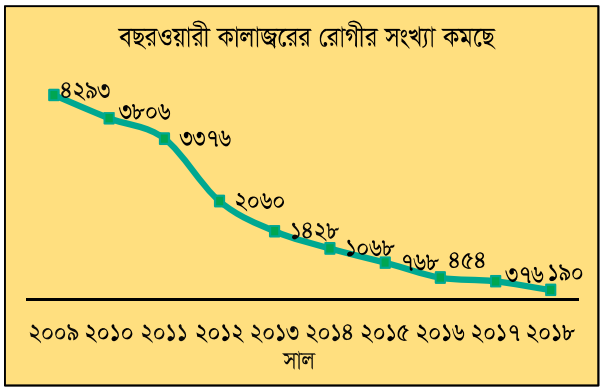

কৃমির সংক্রমণ হ্রাসে সাফল্য

- ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের মধ্যে কৃমি সংক্রমণের হার আগে ছিল ৭৯%। এখন ৮%-এর নীচে।
- ২০০৮ সালে কর্মসূচিটি শুরু হয়েছিল। তখন থেকে কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বছরে ২ বার কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হতো।
- ২০১৭ সাল থেকে দেশের সকল প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের (৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী) কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হচ্ছে।

কুষ্ঠ রোগ নির্মূলে সাফল্য

- বাংলাদেশ থেকে দৃশ্যতঃ কুষ্ঠরোগ নির্মূল হয়েছে।
- কোন এলাকায় প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যায় ১ জন কুষ্ঠ রোগী পাওয়া গেলে সে এলাকাকে কুষ্ঠরোগ অধ্যুষিত এলাকা বলে।
- ২০০৮ সালে বাংলাদেশে এ ধরণের জেলা ছিল ৪টি। ২০১৭ সালে সে সংখ্যা হয়েছে ১টি (নীলফামারী জেলা)।
- ২০০৮ সালে ৫,২৪৯ জন নুতন কুষ্ঠ রোগী সনাক্ত হয়েছিল। ২০১৭ সালে সনাক্ত হয়েছে ৩,৭৫৪ জন।

জলাতঙ্ক নির্মূলে অগ্রগতি

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী ২০১০ সালে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় যা বছরে আনুমানিক ২,০০০ বা তারও বেশী।
- ঐ বছরই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা জাতীয় জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শুরু করে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার বিভাগকেও সম্পৃক্ত করা হয়।
- বিনামূল্যে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক আধুনিক টিকা (আইডিআরভি এবং আরআইজি) প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশের জাতীয় জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল কেন্দ্র এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ টিকাদান কেন্দ্র। এখানে প্রতিদিন প্রাণীর কামড়ে আক্রান্ত ৬০০ থেকে ৮০০ জন জলাতঙ্কের টিকা ও সেবা গ্রহণ করে।
- জলাতঙ্ক নির্মূলের বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি ব্যাপক হারে কুকুরকে টিকা দেয়া। যদি ৭০% কুকুরকে ভ্যাকসিন প্রদান সম্ভব হয় তবে মানুষের দেহে জলাতঙ্ক সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাই ২০১১ সালে কক্সবাজার পৌরসভায় ব্যাপকহারে কুকুর-টিকাদান কার্যক্রম পাইলট আকারে শুরু করা হয়। এখন তা প্রায় সারাদেশেই সম্প্রসারিত। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৬ লক্ষ কুকুর রয়েছে। চলমান কার্যক্রমের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬৩৭,৪৩২টি কুকুরকে টিকা প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূচি- শিশুরাই যেখানে চিকিৎসক

- বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তাদের সহপাঠীদের স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
- ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর প্রতি শ্রেণী বা সেকশন থেকে ৩ জন করে শিক্ষার্থী বাছাই করে ক্ষুদে ডাক্তার দল গঠন করা হয়। এদের একজনকে শ্রেণী শিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। একেক দল একেক শ্রেণী বা সেকশনের দায়িত্বে থাকে।
- ২০১১ সালে এই কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের বছরে ২ বার করে ওজন, উচ্চতা ও দৃষ্টিশক্তি পরিমাপ করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।
- ৯৭% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি চালু রয়েছে।
- ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ক্ষুদে ডাক্তার বছরে ২ বার সহপাঠীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে শিশুদের ওজন, উচ্চতা ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যাজনিত বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে; জনকল্যাণে ভূমিকা রাখছে; দল গঠনে ও দলগতভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে; এবং সংক্রামক রোগসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়কবার্তা সম্পর্কে জেনে তার প্রতিকারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়াসহ সতর্ক হতে পারছে।

ডেঙ্গু রোগ

- ৬০-এর দশকে বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগ হতো। পরবর্তীকালে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে ডেঙ্গু রোগ পুনরাবির্ভূত হয়েছে। ২০০০ সালে আবার ডেঙ্গু রোগ দেখা দেয়। তবে সরকারের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে।

চিকুনগুনিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ

- চিকুনগুনিয়া রোগ বাংলাদেশে ছিল না।
- জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও চিকুনগুনিয়া রোগের আবির্ভাব হয়েছে।
- ২০১৭ সালে ঢাকা মহানগরীতে ব্যাপকমাত্রায় চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক এবং উপযোগী পদক্ষেপের ফলে দ্রুত চিকুনগুনিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণে আসে।
- যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা হলো জাতীয় চিকুনগুনিয়া গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; সারাদেশের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় মশক নিধন; জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি; দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ, চিকিৎসা ও ফলোআপ ইত্যাদি।

হেপাটাইটিস বি ও সি রোগ

- ২০১৭-২০১৮ সালে প্রায় ২৫০ স্বাস্থ্যসেবীকে হেপাটাইটিস-বি জীবানুর বাহক হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের টিকা দেয়া হয়েছে ।
- হেপাটাইটিস-সি একটি জীবনক্ষয়ী রোগ। চিকিৎসাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ রোগের জীবানু বাহক ৮,০০০ রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭ সালে ঢাকায় চিকুনগুনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, এমপি; মেডিকেল শিক্ষক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এডিস মশা নিধনকল্পে নাগরিক সচেতনতা তৈরির জন্য কর্মসূচি পালন করেন।

সুপেয় ও নিরাপদ পানি ও সেনিটেশন

ডায়রিয়াসহ অন্যান্য খাবার ও পানিবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে সাফল্য

- সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে শিরায় প্রয়োগের কলেরা স্যালাইন, খাওয়ার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি ব্যাপক পরিমাণে সরবরাহ করেছে। ফলে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ এবং মৃত্যু নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- ২০১৭ সালের শেষ প্রান্তিকে বাংলাদেশের দু-তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যাক্রান্ত হয়ে পড়ে।
- আগেই ভারত ও নেপালে ব্যাপক আকারে ভিত্তিক বন্যা দেখা দেয়ায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিকল্পিতভাবে পর্যাপ্ত প্রাক-প্রস্তুতি নিয়ে রাখে।
- ফলে ডায়রিয়াজনিত কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি।

এইচআইভি/ এইডস নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি

- ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি কেস সনাক্ত হয়।
- সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিবন্ধনকৃত এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দেশে মাত্র ৫,৫৮৬ জন। ২০১৭ সাল পর্যন্ত মৃত্যু ৯২৪ জন। ৪,৬৬২ জন জীবিত আছেন।
- প্রথম সনাক্তের পর সংক্রমণের হার এখনো ০.০১% এর নিচে। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ হার মাত্র ১%।
- ২০১৫ সালের আগেই এমডিজি'র এইচআইভি সংশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস নির্মূলের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ।

সরকারের প্রতিরোধমূলক সেবাসমূহ

- প্রচার মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি।
- শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মুখে খাওয়ার বিকল্প ঔষধ মিথাডন প্রদান করা হচ্ছে যার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামে এইচআইভি বিষয় সম্পৃক্তকরণ।
- মধ্যপ্রাচ্যগামী সম্ভাব্য প্রবাসীদের মধ্যে এইচআইভি বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম।

চিকিৎসা সংক্রান্ত সেবাসমূহ

- এইচআইভিতে আক্রান্ত ৬৪% ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
- তারা ৬টি সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ পাচ্ছে।
- ১৫০টি এইচআইভি টেস্টিং ও কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ঢাকার মহাখালীস্থ সংক্রামক রোগ হাসপাতালের ২৪ শয্যার পৃথক ওয়ার্ডে এইচআইভি রোগীদের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দু'টি কেন্দ্র ওরাল সাবস্টিটিউট থেরাপি (মিথাডন) কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

পিএমটিসিটি কর্মসূচিতে ব্যাপক সাফল্য

- পিএমটিসিটি মানে প্রিভেনশন অব মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন অব এইচআইভি।
- ৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- এ পর্যন্ত ১০৯ জন এইডস আক্রান্ত গর্ভবতী নারীকে পিএমটিসিটি সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- জন্মগ্রহণকারী ৯১ জন শিশু এইচআইভি সংক্রমণ ছাড়াই সুস্থভাবে জন্ম নিয়েছে। মাত্র ১টি শিশু এইচআইভি পজিটিভ হিসেবে পাওয়া গেছে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এইচআইভি সেবা

২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে হঠাৎ করে স্রোতের মত হাজার হাজার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু মিয়ানমার সরকার কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আসতে থাকে। জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম তখন থেকেই কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এইচআইভি সনাক্তকরণ কার্যক্রম শুরু করে। কক্সবাজার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে আগে থেকেই এইচআইভি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য চিকিৎসা অব্যাহত ছিল। বর্তমানে ২২৬ জন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু (আগস্ট ২০১৮) এন্টি-রেট্রোভাইরাল (এআরভি) ঔষধ গ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছে।

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি

- দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। এর সাথে আসছে অসংক্রামক রোগ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি। এটা অবধারিত। তবে সঠিক পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সরকার সেদিকেই নজর দিয়েছে।
- পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি ও প্রাদুর্ভাব নির্ণয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা STEPs (STEP wise approach to surveillance) নামে একটি জরিপ পরিচালনার সুপারিশ করে থাকে। বাংলাদেশে সম্প্রতি সফলভাবে এ জরিপটি পরিচালিত হয়েছে।
- জরিপের ফলাফল বেশ আশাপ্রদঃ
    - কায়িক পরিশ্রমের হার বৃদ্ধি পেয়েছে
    - লবণ গ্রহণের হার হ্রাস পেয়েছে
    - মদ্য সেবন নেই বললেই চলে
- হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ ও সর্প দংশন প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় নির্দেশিকা/ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার PEN (Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions) প্রটোকল গাইডলাইন প্রণয়ন এবং গ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)-এর অনলাইন রিয়েলটাইম ডাটা পোর্টাল DHIS2 সফটওয়্যারে অসংক্রামক রোগের তথ্য সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- সর্প দংশনে ব্যবহৃত প্রতিষেধক এন্টিভেনোম দেশেই তৈরির লক্ষ্যে বিশ্বমানের ভেনোম রিসার্চ সেন্টার চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজে স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের দুইটি প্রধান মহানগরীতে (ঢাকা উত্তর ও খুলনা) 'স্বাস্থ্যকর শহর প্রকল্প' (Healthy City Project) গ্রহণ করা হয়েছে।
- 'কমিউনিটি ভিত্তিক এনসিডি ব্যবস্থাপনা মডেল' ও 'কমিউনিটি ভিত্তিক পানিতে ডোবা প্রতিরোধ কর্মসূচি (আচল)' চলমান রয়েছে।

জাতীয় সমন্বিত এনসিডি নীতিমালা/কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা

- জাতিসংঘের বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ হচ্ছে 'বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Multisectoral Action Plan)'।
- স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে স্বাস্থ্যখাত ভিন্ন অন্যান্য সকল অংশীদারদের সমন্বিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে 'অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Multisectoral Action Plan for prevention and control of NCD)'।
- এ লক্ষ্যে একটি জাতীয় পর্যায়ের 'অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে যার প্রধান হচ্ছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। এই কমিটির আলোকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তাদের সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি ঠিক করা আছে।
- জাতীয় কমিটি প্রতিবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ধূমপান নিয়ন্ত্রণ

- বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়ন ও জনবল দিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরি সহায়তায় 'বৈশ্বিক বয়স্ক তামাক জরিপ গ্যাটস' সম্পন্ন করেছে।
- এই জরিপ অনুযায়ী ধূমপায়ীর হার হ্রাস উৎসাহজনক। ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ১৮.৫% করে কমেছে।
- পরোক্ষ ধূমপান ও তামাক কোম্পানীর বিজ্ঞাপন প্রচার হ্রাস পেয়েছে। ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিতকরণ কর্মসূচি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী, সময়োপযোগী ও যথার্থ আইন, ধারা ও নীতিমালা রয়েছে। এছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স রয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই রাজনৈতিক ঘোষণা তামাক নিয়ন্ত্রণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানসিক স্বাস্থ্য, অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তনয়া সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বিশ্ব পরিমন্ডলে উপেক্ষিত উদ্বেগজনক জনস্বাস্থ্য সমস্যাটিকে স্বাস্থ্যসেবার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার আন্তর্জাতিক ভূমিকায় সফল হয়েছেন।
- বাংলাদেশের নেতৃত্বে জাতিসংঘ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অটিজম বিষয়ক দুটি পৃথক রেজুলেশন গ্রহণ করেছে।
- বাংলাদেশ সরকার সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা) স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একটি অটিজম সেল স্থাপন করা হয়েছে। নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার (এনডিডি) ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ২৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- সূচনা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় একটি বিস্তারিত, যথাযথ ও সুসংহত 'জাতীয় স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার কৌশলপত্র ২০১৬-২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার বর্তমানে এই কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন করছে।
- 'মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার জরিপ' পরিচালিত হয়েছে। এ বছর 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ' চলমান রয়েছে।
- 'প্রাথমিক সেবা কাঠামোতে সমন্বিত প্রতিবন্ধিতা সেবা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মানিকগঞ্জের শিবালয়ে একটি পাইলট প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- ঢাকার কেরানীগঞ্জে 'স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতার সমন্বিত ও সুসংহত সেবা কার্যক্রম'-র একটি পাইলট প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেলিব্রেটিদের নিয়ে অটিজম বিষয়ে ১৫টি টিভি স্পট তৈরি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার কর্মসূচি

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নয়ন আদর্শ গ্রাম কার্যক্রম

২০০৯-২০১৬ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলার ১২৭ টি স্বাস্থ্য শিক্ষা আদর্শ গ্রামে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন কার্যক্রম

২০০৯-২০১৮ অর্থ বছরে দেশব্যাপী নিবিড় স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবছর সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়ায় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচার কার্যক্রম

প্রতিদিন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নব আবির্ভূত রোগের প্রাদুর্ভাব বিষয়ক বিভিন্ন স্বাস্থ্য বার্তা বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার করা হয়েছে।

ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

ঢাকা শহরের কয়েকটি স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ও এবং জেলা সদর হাসপাতালে স্বাস্থ্য বার্তা সম্বলিত বিলবোর্ড ও ডিজিটাল সাইনিং স্ক্রল স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা বার্তা প্রচার কার্যক্রম চলছে।

টেলিভিশনে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রচার

- প্রতি বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে টকশো আয়োজন।
- দুর্যোগকালীন সময়, নব আবির্ভূত রোগের প্রাদুর্ভাব, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধ, বিশ্ব রক্তদান দিবস উপলক্ষে টিভি স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
- বন্যাকালীন স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা

- USAID-এর সাহায্যপুষ্ট বিকেএমআই সংস্থার সহযোগিতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে।
    - স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ওয়েব পেইজ (www.bhe.dghs.gov.bd) চূড়ান্ত করা হয়েছে।
    - ডিজিটাল আর্কাইভ চূড়ান্ত করা হয়েছে।
    - ই-লার্নিং কোর্স চালু করা হয়েছে।
- Unicef-এর সহযোগিতায় ১৩টি জেলায় WASH programm এর আওতায় Behavioral change, water sanitation and hygiene practices বিষয়ক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

দেশজ ও হোমিও চিকিৎসায় অগ্রগতি

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার এবং প্রয়োগ ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা রাখে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন দেশজ চিকিৎসা যেমন হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার হোমিও ও দেশজ চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিগত দশ বছরে যেমন একদিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। অন্যদিকে এই চিকিৎসা পদ্ধতির মানোন্নয়নে বিগত সাত বছরে প্রায় ১৬টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১৯৯৬-২০০১ সাল মেয়াদে

- ৪৫ জন্য মেডিকেল অফিসার নিয়োগ পেয়েছেন।
- ২০৩ জন জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

২০০৯-২০১৩ সাল মেয়াদে

- ১৩টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও ৪টি বেসরকারি ইউনানী-আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৩,৫৯৩ জন।

২০১৪-২০১৮ সাল মেয়াদে

- ২২৫ জন ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার/প্রভাষক নিয়োগ পেয়েছেন।
- ৩টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৫,২৪৬ জন।

২০০৯-২০১৮ মেয়াদে

- ১৫৩টি ডাক্তার ও ১৫৩টি এএমসি কম্পাউন্ডারের পদ সৃষ্টি হয়েছে। ৪৩টি ডাক্তার ও ৬৪টি সাপোর্ট পারসোনেল (কম্পাউন্ডার) পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।
- ৪৮২টি ভেষজ বাগান স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- অসংখ্য বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
- গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- সরকারি তিব্বিয়া কলেজ, সিলেটকে (ডিপ্লোমা) থেকে সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিলেট (স্নাতকমানে) রূপান্তর করা হয়েছে।
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক কারিকুলামের মানোন্নয়ন করা হয়েছে।
- বর্তমানে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশকে DHIS2 সফটওয়্যারের বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করায় জার্মান সরকার ২০১৪ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগকে বেস্ট প্র্যাকটিস এওয়ার্ড প্রদান করে এবং প্রকাশ করে A Quiet Revolution in Health Information System in Bangladesh নামে একটি বিশেষ বই।

স্বাস্থ্যখাতে তথ্য প্রযুক্তির নীরব বিপ্লব

- বাংলাদেশের পুরো সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা ব্যবস্থাকেই তথ্যপ্রযুক্তির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। যা জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী পর্যন্ত বিস্তৃত।
- প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় দেশের জাতীয়, বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকগণের সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পর্যালোচনামূলক ভিডিও কনফারেন্সিং। মাসের তৃতীয় সোমবার এই কনফারেন্সে যুক্ত হন সকল উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক স্ব স্ব জেলার সিভিল সার্জন অফিসের ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত থেকে। দ্রুত চালু হবে ইউনিফায়েড কমিউনিকেশনস সিস্টেম। এর মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত হাই কোয়ালিটি ভিডিও ও অডিও ব্যবস্থায় ভিডিও কনফারেন্স করা যাবে। এজন্য প্রান্তিক পর্যায়ে কোন পৃথক ভিডিও কনফারেন্স ডিভাইস লাগবে না। এ ধরণের ব্যবস্থা বিশ্বে বিরল।
- প্রায় ১০০টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে।
- হেলথ কলসেন্টার 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ১৬২৬৩ এই নম্বরে ফোন করে দিন-রাত যে কেউ বিনামূল্যে নিতে পারেনঃ (ক) চিকিৎসকের পরামর্শ; (খ) এম্বুলেন্স বুকিং; (গ) অভিযোগ ও পরামর্শ জানানো এবং (ঘ) স্বাস্থ্যতথ্য প্রাপ্তির সুযোগ।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ ও পরামর্শের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা মূল্যায়নভিত্তিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিমোট ইলেক্ট্রনিক অফিস এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশকে DHIS2 সফটওয়্যারের বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ জন্য জার্মান সরকার ২০১৪ সালে বাংলাদেশকে বেস্ট প্র্যাকটিস এওয়ার্ড প্রদান করে এবং A Quiet Revolution in Health Information System in Bangladesh নামে বিশেষ বই প্রকাশ করে।
- অনলাইনে প্রতিটি কমিউনিটির প্রসূতি মা ও অনূর্ধ্ব ৫ শিশুদের নিবন্ধন ও ট্র্যাকিং করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- জিও কো-অর্ডিনেট ভিত্তিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রি চালু করা হয়েছে।
- এমবিবিএস এবং ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রতিটি স্তর ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিশ্ছিদ্র পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়েছে।
- সর্বাধুনিক ডাটা সেন্টার এবং রিমোট ডিজেস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে এসিআর সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

১৩,৭৭৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিটিতে ল্যাপটপ প্রদান

২৪ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে ইন্টারনেট সংযোগসহ ট্যাবলেট প্রদান

সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট

প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য আদান-প্রদান, ই-রেজিস্ট্রেশন, স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন, টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং

জাতীয় হেলথ কল সেন্টার

ডাক্তারের সাথে কথা বলুন ২৪ ঘন্টা

স্বাস্থ্য তথ্য

স্বাস্থ্য পরামর্শ

এম্বুলেন্স এর তথ্য

৯৫টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন।
এ পর্যন্ত সেবা দিয়েছে ৫৫ হাজারের বেশী রোগীকে।

চিকিৎসা গবেষণায় অধিকতর মনোযোগ

চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি)। মহাখালীতে নিজস্ব ভবনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি দেশে চিকিৎসা গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ভূমিকা পালন করে। গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ, গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ এবং নৈতিকতার ছাড়পত্র প্রদান প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ। নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু স্বাস্থ্যসেবা, শ্বাসনালীর সংক্রমণ, সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগ, পুষ্টি, হেলথ সিস্টেম এবং পেশা ও পরিবেশ গবেষণাকে প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিএমআরসির রয়েছে অসংখ্য গবেষণা নিবন্ধ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিকিৎসা গবেষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। তার আমলে বিএমআরসি খুবই আনুকূল্য পেয়ে থাকে। বিএমআরসিতে বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার স্থাপিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সমর্থনে। এই সেন্টারটি জীন গবেষণার সর্বোচ্চ ধাপে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে এদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের পথ দেখাবে।

বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরকার কর্তৃক যথাযথ অর্থ বরাদ্দ পেয়ে গবেষণাখাতে বিএমআরসিসহ দেশের বিভিন্ন একাডেমিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য গবেষকদের গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আরও কয়েকটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান যথা আইইডিসিআর, নিপোর্ট, জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, নিপসম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রচুর গবেষণা করে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বনামধন্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআরবি'র সাথেও গবেষণার কাজে প্রভূত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বছরওয়ারী বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানী
(মিলিয়ন টাকা)

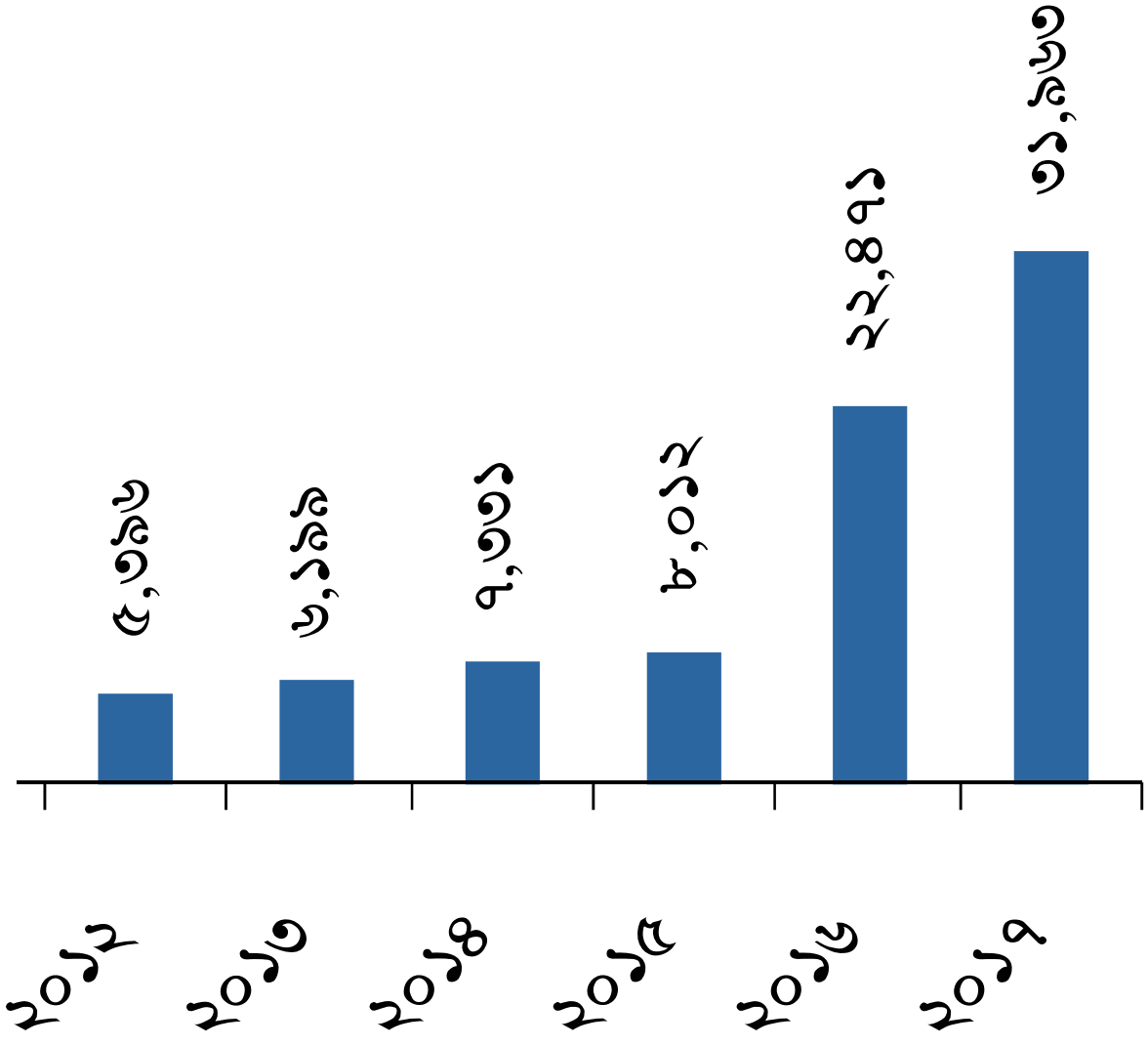

ঔষধ শিল্পে স্বর্ণযুগ

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ঔষধ আমদানি করতে হত। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়রোধে স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় ঔষধ আমদানির লক্ষ্যে একটি সেল গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু দেশে মানসম্মত ঔষধের উৎপাদন বাড়ানো এবং এ শিল্পকে সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর' গঠন করেন। দেশে মানসম্পন্ন ঔষধ নিশ্চিত করার জন্য ঔষধ উৎপাদন, বিপণন এবং আমদানি-রপ্তানি অধিকতর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন। দেশীয় চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৪৫টি দেশে ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। গত ৬ বৎসর ঔষধ রপ্তানি বেড়েছে ৫ থেকে ৩১ বিলিয়নে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালকে Product of the Year ২০১৮ ঘোষণা করেছেন। সরকার কর্তৃক ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় একটি এপিআই পার্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পার্কের নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ৪৪টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এপিআই পার্কটিতে শীঘ্রই ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে আধুনিক মেশিনারী স্থাপন এবং অবকাঠামো উন্নয়নসহ ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি (NCL)-কে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আমেরিকান এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (ANAB) কর্তৃক উক্ত ল্যাবরেটরি ISO/IEC ১৭০২৫: ২০১৭ এ্যাক্রিডিটেশন সনদ প্রাপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং তাদের ১,১৯১টি মেডিকেল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক লেভেল-১ (মডেল ফার্মেসী) এবং লেভেল-২ (মডেল মেডিসিন শপ)-এর বৈশিষ্ট্য অনুমোদন করে দেওয়া হয়েছে। মডেল ফার্মেসীসমূহ গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট কর্তৃক পারিচালিত হয়। ইতোমধ্যে ২২টি জেলায় ৪২১টি মডেল ফার্মেসী ও মডেল মেডিসিন শপ উদ্বোধন করা হয়েছে। ফার্মাকোভিজিল্যান্স-এর জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ADRM Cell, WHO Uppsala Monitoring Center-এর ১২০তম সদস্যপদ অর্জন করেছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রিপোর্টিং, নকল ঔষধ ও নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয়ের বিষয়ে অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ দাখিলের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। আমদানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত ঔষধের ব্লক লিস্ট অনলাইনে অনুমোদনের জন্য একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে।

এদিকে সরকারের একমাত্র রাষ্ট্রায়াত্ত ঔষধ কোম্পানী এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমুহে ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধিতে আরও সক্ষমতা অর্জনের জন্য গোপালগঞ্জে একটি বিরাট ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছে। এটি ইডিসিএল-এর ঢাকা ও বগুড়া ফ্যাক্টরীর অতিরিক্ত। গোপালগঞ্জের ফ্যাক্টরীতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি, পেনিসিলিন ও স্যালাইন তৈরি করা হবে।

আইন ও বিধি-প্রবিধি, নীতি এবং কর্মকৌশল প্রণয়ন ও আধুনিকীকরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আমলে জনস্বার্থে স্বাস্থ্য বিষয়ক সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় আইনপ্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। বিধি-প্রবিধি, নীতি এবং কর্মকৌশল যখন যা প্রয়োজন তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা ২৪টি স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি প্রণয়ন করেছেন। বঙ্গবন্ধু ২টি এবং শেখ হাসিনা ২২টি। নীচে সেগুলোর তালিকা দেয়া হলোঃ

আইন, বিধি-প্রবিধি ও অধ্যাদেশ

- বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস আদেশ, ১৯৭২
- ব্লাইন্ড রিলিফ (ডোনেশন অব আই) আইন, ১৯৭৫
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮
- মানবদেহে অংগ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯
- বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ২০১৭
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধি, ২০১৫
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩
- চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬
- বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬
- বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস আইন, ২০১৮
- কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্ট আইন, ২০১৮
- মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল আইন, ২০১৮

রহিত

- বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস আদেশ, ১৯৭২ (বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস আইন, ২০১৮ দ্বারা রহিত)
- এপিডেমিক ডিজিজেস আইন, ১৮৯৭ (সংক্রামক ব্যাধি আইন ২০১৮ দ্বারা রহিত)
- পাবলিক হেলথ (ইমার্জেন্সি প্রভিশনস) অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৪ (সংক্রামক ব্যাধি আইন ২০১৮ দ্বারা রহিত)
- বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন বোর্ড (রিপিল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭ (সংক্রামক ব্যাধি আইন ২০১৮ দ্বারা রহিত)
- প্রিভেনশন অব ম্যালেরিয়া (স্পেশাল প্রভিশনস) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮ (সংক্রামক ব্যাধি আইন ২০১৮ দ্বারা রহিত)

সংশোধিত

- ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

সংশোধনাধীন

- বেসরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিক আইন, ১৯৮২ (সংশোধনাধীন)

প্রণয়নাধীন

- ঔষধ সংক্রান্ত আইন, ২০১৮
- আইসিডিডিআর,বি আইন, ২০১৮
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন
- বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আইন, ২০১৮
- বাংলাদেশ ইউনানী এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা আইন, ২০১৮
- জাতীয় টিকা (প্রতিরোধক) আইন, ২০১৮

প্রণীত নীতি

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১
- জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৫
- জাতীয় ঔষধনীতি, ২০১৬
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৮

কর্মকৌশল (প্রণীত)

- জাতীয় অভিবাসী স্বাস্থ্য কর্মকৌশল, ২০১৫-২০১৮
- তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০১১-২০১৬
- চতুর্থ জাতীয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭-২০২২
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুপাক্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-২০২৫
- জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা, ২০১৬-২০২৫
- জাতীয় কর্মকৌশল, ২০১৮-২০২২
- স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা, ২০১৬-২০২১
- জাতীয় বয়ঃসন্ধিকাল স্বাস্থ্য কর্মকৌশল, ২০১৭-২০৩০
- জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কর্মকৌশল, ২০১৭-২০৩০
- জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭-২০২০
- জাতীয় জলাতংক নির্মূল কর্মকৌশল, ২০১৭-২০২২
- জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মকৌশল, ২০১৭-২০২১

চলমান

- সমন্বিত সামাজিক ব্যবহার পরিবর্তনে যোগাযোগ কর্মকৌশল
- জাতীয় শিশুস্বাস্থ্য কর্মকৌশল
- জাতীয় কালাজ্বর নির্মূল কর্মকৌশল, ২০১৮-২০২২ (আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াধীন)

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে বাজেট ছিল বর্তমান অর্থ বছরের (২০১৮-২০১৯) বাজেট তার ৭ গুণ। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর বরাদ্দ ছিল ৩,৪২৩ কোটি টাকা। কিন্তু, শেখ হাসিনা সরকার গঠন করে সংশোধিত বাজেটেই তা ৬,১৯৬ কোটি টাকা করেন। ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয়ও করেন।

- পরবর্তী ২০০৯-২০১০ অর্থবছর বাজেট করা হয় ৬,৯৮০ কোটি টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সে বাজেট হয় ৯,৪৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ শেখ হাসিনা সরকারের ২০০৯-২০১৩ মেয়াদের প্রথম বাজেটের দেড় গুণের মত।

- তৃতীয় মেয়াদের সরকারের প্রথম বাজেট ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ১১,১৪৬ কোটি টাকা। তা তৃতীয় মেয়াদের শেষবর্ষে (২০১৮-২০১৯) এসে হয় ২৩,৩৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ দু'গুণেরও বেশী।

- ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচিতে উন্নয়ন খাতে ৪৩,৪৮৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকার ২৪,৬৩৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন সহযোগীগণ ১৮,৮৪৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা সংস্থান করবে। এছাড়াও সরকার স্বাস্থ্যখাতে পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য আলাদা অর্থবরাদ্দ করবে। বাংলাদেশ সরকার ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচির মোট ব্যয়ের ৮৩.৬৮ ভাগ নির্বাহ করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১৪টি অপারেশনাল প্লানের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আগামী সাড়ে ৫ বছরের এই কর্মসূচি ভিত্তি রচনা করবে।

- চলতি অর্থ বছর (২০১৮-২০১৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বরাদ্দ ১১,১৪১ কোটি টাকা।

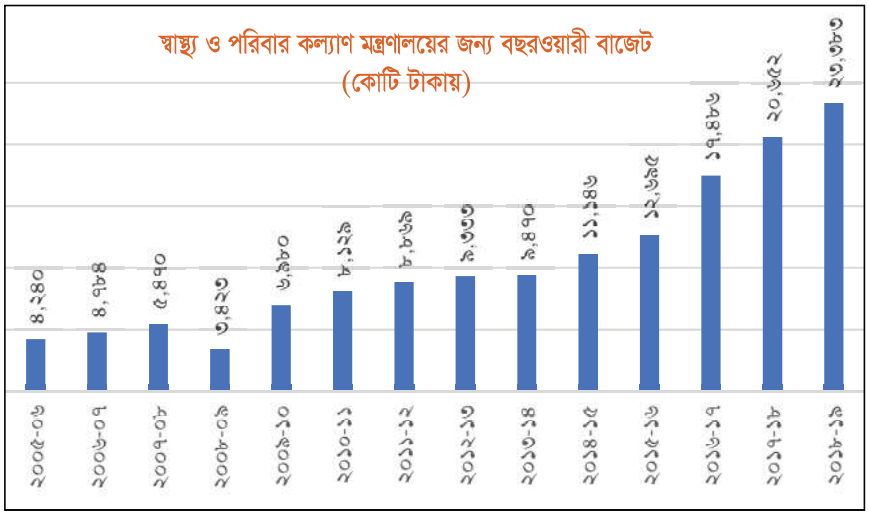

স্বাস্থ্যসেবায় বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় উদ্যোগে ক্রমাগত উৎসাহ দান

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে আসছে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, যশোর এবং ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতাল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডা. মার্গারেট চ্যান চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করে একে সারা দেশের জন্য একটি মডেল বিবেচনা করে তা সকল উপজেলা ও জেলাতে সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। চৌগাছা মডেলটি রচনা করেন ডাঃ এমদাদুল হক নামের একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক। এই চিকিৎসক যখন পদোন্নতি পেয়ে ঝিনাইদহ জেলা হাসপাতালে যোগদান করেন তখন ঝিনাইদহ জেলা হাসপাতালেও তিনি চৌগাছার মডেলটিই বাস্তবায়িত করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুরস্কৃত সরকারি হাসপাতালগুলোর সাফল্যের একটা বড় উপাদান হলো জনগণের মধ্যে হাসপাতালটি যে তাদের এই উপলব্ধি জাগ্রত করে দেয়া। স্থানীয় জনগণ হাসপাতালের জন্য জনবল ও ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজন মেটাতে প্রায়শঃই এগিয়ে আসেন। শুধু তাই নয় চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারীদের সাথে জনগণের সুসম্পর্কও গড়ে ওঠে এর মাধ্যমে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের জন্য অঙ্গীকাবদ্ধ। এর একটি হল সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন করা। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে যেসব দেশ তাদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যসেবায় সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার। আমাদের দেশেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণকে নিয়ে সে লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সম্প্রতি দেশের প্রায় সবগুলো সরকারি জেলা-উপজেলা হাসপাতালে সি-জে মডেল (চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেল) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য ডা. এমদাদুল হককে ইউনিসেফের সহায়তায় পরামর্শক হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি হাসপাতালে সি-জে মডেল বাস্তবায়নও হচ্ছে। চৌগাছা-ঝিনাইদহ'র আদর্শে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের জন্য যেসব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদেরই চিহ্নিত করছে এবং সহায়তা করবে।

বেসরকারি উদ্যোগ কেবল সি-জে মডেলেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা মোটেই বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা হতে পারে না। বেসরকারি খাত সরকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবায় এগিয়ে আসলে দেশের মানুষের জন্য দেশে বসেই উন্নততর ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম মেয়াদে সরকার গঠনের পর থেকেই এই নীতির আলোকে বেসরকারি খাতকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতে শুরু করেন। তিনি চিকিৎসার যন্ত্রপাতির ওপর থেকে ক্ষেত্র বিশেষে আমদানি শুল্ক হয় প্রত্যাহার না হয় হ্রাস করেন যাতে বেশী বেশী সংখ্যায় বেসরকারি খাতে হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৯৭ সালে যেখানে মাত্র ৮৮৫টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক ছিল তা বর্তমানে ৫,১৩৯টিতে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে রেজিস্টার্ড বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে শয্যা সংখ্যা ছিল ১৫,৪৬৮। বর্তমানে তা ৮৬,৫০০।

এপোলো হাসপাতাল, ইউনাইটেড হাসপাতাল, স্কয়ার হাসপাতাল, ল্যাব এইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ হাসপাতাল, আজগর আলী হাসপাতালের মত উন্নত দেশের মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সে উদ্যোগেরই ফসল। ১৯৯৯ সালে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ১১টি। বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ছিল ৩টি। এখন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৬৯টি। বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ২৭টি।

হতদরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্যসেবাঃ বৃক্ষমানব, মুক্তামনি, ছফুরা-তহুরাদের জন্য মানবতার হাত

সম্প্রতি বাংলাদেশে স্বাস্থ্য মানবিকতার বিশেষ একটি অধ্যায় রচিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে। দেশের সরকারপ্রধান শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা পেয়েছে অসংখ্য দরিদ্রজন। অনেকেই মুক্তি পেয়েছে মারাত্মক ধরনের সব অসুস্থতা হতে। সাতক্ষীরার মুক্তামনি, বৃক্ষমানব আবুল বাজানদার, জন্ম থেকেই জোড়া লাগা জমজ ছফুরা-তহুরারাই উদারহণ। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে জনগোষ্ঠীর একটা অংশ এখনও দরিদ্র। পূর্ণ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বাস্তবায়ন না হওয়ায় স্বাস্থ্য খরচের ৬৭% মানুষকে নিজের পকেট থেকেই বহন করতে হয়। অনেকেই চিকিৎসা নিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হওয়ায় দেশের সব মানুষের জন্য বিনে পয়সায় চিকিৎসার নিশ্চয়তা দেয়া সরকারের জন্য কঠিনও বটে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতদরিদ্র স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প নিয়ে ভাবছে। যদি এক লক্ষ পরিবারের জন্য গড়ে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা করে ব্যয় হয় তবে বছরে ৫ শত কোটি টাকা লাগবে। ৪ বছরে লাগবে ২ হাজার কোটি টাকা। তাহলে হয়তো ৪ লাখ প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যাবে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষাঃ এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা মানে প্রতিরোধযোগ্য রোগ নির্মূল বা উচ্ছেদ, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন। সাধারণ সর্দি জ্বর থেকে হৃদরোগ, ক্যান্সার বা যে কোন জটিল রোগ। সকল রোগের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। যে নিঃস্ব, যে গরীব তাকে কোন টাকাই খরচ করতে হবে না। যে ধনী, যে কিছুটা দিতে পারে সে সাধ্যমত রাষ্ট্র পরিচালিত জাতীয় স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করবে কিস্তিতে। ফলে রোগ যখন বাসা বাঁধবে দেহে, চিকিৎসার জন্য থাকবেনা কোন দুঃশ্চিন্তা।

আশার কথা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি, মধুপুর এবং ঘাটাইল উপজেলায় একটি উদ্ভাবনমূলক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি বা এসএসকে চালু করেছে। এলাকার সকল দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যকার্ড দেয়া হয়েছে। এই কার্ডের বিপরীতে পরিবারের সদস্যরা বছরে ৫০ হাজার টাকা পরিমাণ চিকিৎসা সেবা বিনামূল্যে পেয়ে থাকে। সরকারি বা বেসরকারি যে কোন স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র বা হাসপাতাল থেকে এই সেবা পাওয়া যায়। সরকারই বীমার প্রিমিয়াম দিয়ে থাকে। এটিকে অনেকেই শেখ হাসিনা হেলথ কেয়ার নামে অভিহিত করে থাকেন। এই কর্মসূচি সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা আছে।

সমন্বয়, সহায়তা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে মহাপরিচালক ও অধিদপ্তরকে সহায়তা দানের জন্য সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্রের ধারনাটি আসে। স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত কিছু নির্বাচিত চৌকস তথ্য প্রযুক্তিদক্ষ, কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ কিছু কর্মকর্তার সহযোগে কেন্দ্রটি সমন্বিত হয়। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে কেন্দ্রটি। স্বাস্থ্য বিষয়ক আইনের খসড়া তৈরি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভাজন প্রস্তাব, স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, উদ্ভাবনামূলক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির অধিকতর প্রয়োগসহ অনেক কর্মকান্ড সফলতার সাথে করতে পেরেছে। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবাদানে কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য সমঝোতা স্মারকের খসড়া তৈরি এবং সমন্বয় ও ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য কলেরার টিকা সংগ্রহ ও সফলভাবে বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে এটি। চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেল, মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন, বহুমুখী স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, জরুরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় এম্বুলেন্স সেবা প্রবর্তন, দুঃস্থ স্বাস্থ্যসেবা, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর স্বাস্থ্য অঙ্গন বাস্তবায়ন ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে কিভাবে নুতন চিন্তা কাজে লাগানো যায় বা কিভাবে উৎকর্ষ সাধন করা যায় তা নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটায় কেন্দ্রটি।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক স্বাস্থ্যসেবায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মায়ানমারে রাখাইন রাজ্যে নুতন করে ভয়াবহ রকমের সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও গণহত্যা শুরু হয় ২০১৭ সালে। ঐ বছর ২৫ আগস্ট থেকে স্রোতের মত বাংলাদেশের কক্সবাজারে আসতে থাকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ। জীবন বাঁচাতে। সম্ভ্রম বাঁচাতে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা ঢুকে পড়ে। আগে থেকেই আসা রোহিঙ্গাদের নিয়ে তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ। মাদার অব দ্য হিউম্যানিটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের মানবিক দিকটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নেন। আশ্রয়, খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের পূর্ণ আশ্বাস দেন। বলেন "আমরা যদি ১৬ কোটি মানুষের অন্নের সংস্থান করতে পারি, তাহলে আমরা আরো ৫-৭ লাখ মানুষকে খাওয়াতে পারব। প্রয়োজন হলে একবেলা খেয়ে আরেক বেলার খাওয়া এই নিপীড়িত মানুষগুলোর সাথে ভাগ করে নেব। সব কিছুর পরও আমরা তো মানুষ এবং আমরা মানবতার পক্ষে।" বাংলাদেশের স্থপতি মহান হৃদয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষেই শুধুমাত্র এমনটি করা সম্ভব। ফলে বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং সমর্থন পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্ব সংবাদমাধ্যম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই পরম বিবেকবোধকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেনি। তাকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' আখ্যা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই বিবেকবোধ এবং দায়িত্বশীলতার জন্যে তিনি রোহিঙ্গা ইস্যুতে আরও ২ টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগও অলস বসে থাকেনি। নিজেদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ দায়িত্ববোধ এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তুত্যাগী পরদেশীর জন্য বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যসেবাটি দিয়েছে। এজন্য বিশ্ববাসীর কাছে পেয়েছে অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা। স্বাস্থ্য বিভাগ/অধিদপ্তর যে সেবাগুলো দিয়েছে তা সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো।

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিচালনা করা হয় ১৯৯টি। হেলথ পোস্ট ১৪৫টি। প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার ৩৭টি। ডেলিভারি সেন্টার ১৭টি। ১৩১ জন চিকিৎসক, ১৩৬ জন নার্স ও ১০১ জন স্বাস্থ্য সহকারী কাজ করেন। এম্বুলেন্স ব্যবহৃত হয় ২১টি। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পালিত হয়। বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিশুকে পোলিও, ডিপথেরিয়া, কলেরা ও হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হয়। বেশ কয়েকটি রাউন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ কলেরার টিকা খাওয়ানো হয়েছে। ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশন দেয়া হয়। দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য নিয়মিত ইপিআই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। নবজাতকদের প্রয়োজনীয় মেডিকেল পরিচর্যা দেয়া হয়। গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে হাজার হাজার স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন করা হয়েছে। ৬-৫৯ মাস বয়সী পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সহায়তা প্রদান ছাড়াও ভিটামিন-এ এর পাশাপাশি কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কক্সবাজারে একটি কো-অর্ডিনেশন সেল স্থাপন করেছে। এই সেল স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশী-বিদেশী সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসমন্বয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যতম উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য। মানসিক ও মনোরোগ স্বাস্থ্য সহায়তাও দেয়া হচ্ছে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদী কীটনাশকযুক্ত মশারী বিতরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে চমৎকার একটি ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারের স্বাস্থ্যসেবা এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে রিয়েল টাইম তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ এমডিজি-৪ পুরস্কার ২০১০

আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল এচিভমেন্ট এওয়ার্ড ২০১৮

জাতিসংঘ ডিজিটাল হেলথ ফর
ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট পুরস্কার ২০১১

WHO Excellence in Public Health
in South-East Asia Award 2014

সাউথ-সাউথ ২০১৩ *MDG* পুরস্কার

মা ও নবজাতকের টিটেনাস মুক্ত হওয়ায়
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সনদ ২০১৬

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

১. ২০১০ সালঃ শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে দেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্যে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য জাতিসংঘ এমডিজি-৪ পুরস্কার

২. ২০১১ সালঃ স্বাস্থ্যখাতে সফল ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাতৃস্বাস্থ্যে উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট পুরস্কার

৩. ২০১১ সালঃ স্বাস্থ্যখাতে ICT-র সফল প্রয়োগের জন্য Global Health and Children's Award

৪. ২০১৩ সালঃ এমডিজি-১ অর্থাৎ দেশে দারিদ্র্য হ্রাসে অবদানের জন্য সাউথ-সাউথ ২০১৩ Millennium Development Goal (MDG) পুরস্কার

৫ ২০১৪ সালঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পোলিও মুক্ত দেশের সনদ (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য ১০টি দেশের সাথে; ২৭ মার্চ ২০১৪)

৬. ২০১৬ সালঃ মা ও নবজাতকের টিটেনাস মুক্ত হওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সনদ (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য ১০টি দেশের সাথে)

৭ ২০১৮ সালঃ রুবেলা ও কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (সিআরএস) নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সনদ (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য ৬টি দেশের সাথে, ২ আগস্ট ২০১৮)

৮. ২০০৯ ও ২০১২ সালঃ টিকাদান কর্মসূচি ও শিশু স্বাস্থ্যে অসাধারণ ধারাবাহিক সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্যাভি পুরস্কার

৯. ২০১২ সালঃ স্বল্প মূল্যে ভালো স্বাস্থ্যসেবায় পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ হিসেবে লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিকাল মেডিসিন এবং রকফেলার ফাউন্ডেশন কর্তৃক গুড হেলথ এ্যাট লো কস্ট নামক বই প্রকাশ

১০. ২০১৩ সালঃ স্বাস্থ্যখাতে এশিয়ায় বিস্ময়কর সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বখ্যাত ল্যানসেট চিকিৎসা সাময়িকী কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সাফল্য নিয়ে ৬টি সিরিজ প্রকাশ (ডিসেম্বর ২০১৩)

১১. ২০০৭ সাল থেকেঃ টিকাদান কর্মসূচি, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যে অসামান্য অগ্রগতির দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশ্বখ্যাত সুইডিশ স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হ্যান্স রোজলিং কর্তৃক ইউটিউবে মিরাকল বাংলাদেশ শীর্ষক জনপ্রিয় ভিডিও প্রকাশ

১২. ২০১৪ সালঃ অটিজম বিষয়ে অনবদ্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী তনয়া সায়েমা হোসেনকে WHO Excellence in Public Health in South-East Asia Award

১৩. ২০১৫ সালঃ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে সুদূরপ্রসারি রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্ব দানের জন্য চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ এওয়ার্ড

১৪. ২০১৮ সালঃ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের প্রতি মানবিক আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল এচিভমেন্ট এওয়ার্ড

১৫. ২০১৮ সালঃ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের প্রতি মানবিক আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ স্পেশাল ডিস্টিংকশন এওয়ার্ড ফর লিডারশিপ

১৬. ২০১৬ সালঃ অটিজম বিষয়ে অনবদ্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী তনয়া সায়েমা হোসেনকে WHO Goodwill Ambassador for Autism এবং WHO Regional Champion for Autism হিসেবে মনোনয়ন

রুবেলা ও কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম নিয়ন্ত্রণের সাফল্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সনদ ২০১৮

টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যে গ্যাভি পুরস্কার ২০১২

যাদের শ্রমে এই বই

উপদেষ্টা

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জাহিদ মালেক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সিরাজুল হক খান, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জি এম সালেহ উদ্দিন, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রধান সম্পাদক

অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক

অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
অধ্যাপক ডা. এএইচএম এনায়েত হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
অধ্যাপক ডা. বে-নজির আহমেদ, জাতীয় পরামর্শক, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মো. আমিরুজ্জামান, উপ পরিচালক, প্রশাসন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরামর্শক

ডা. সমীর কান্তি সরকার, পরিচালক, আইপিএইচএন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. শায়লা হোসেন, পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন
অধ্যাপক ডা. মোঃ আবদুর রশিদ, পরিচালক, মেডিকেল এডুকেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. সানিয়া তাহমিনা ঝোরা, পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ শামিউল ইসলাম, পরিচালক, এমবিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ রওশন আনোয়ার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল হাসেম খান, লাইন ডাইরেক্টর, সিবিএইচসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, পরিচালক, আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. খাজা আব্দুল গফুর, পরিচালক, অর্থ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. সুলতান মোঃ শামসুজ্জামান, লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ ইউসুফ, পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মনোয়ারা সুলতানা, পরিচালক, হোমিও এবং দেশজ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. উম্মে সালমা আবদুল্লাহ, পরিচালক, ডেন্টাল , স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. নির্মলেন্দু চৌধুরী, পরিচালক, আইপিএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ আমিনুল ইসলাম মিঞা, পরিচালক, এইডস/এসটিডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মোঃ আব্দুল আজিজ, প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মওলা বক্স চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (সমন্বয়), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সম্পাদনা সদস্য

ডা. মুহাম্মদ মুশতাক হোসেন, পরামর্শক, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ এমদাদুল হক, পরামর্শক, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. শাহীন আহমেদ, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. বি এম রিয়াজুল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. ইসরাত জাহান, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. নুসায়ের চৌধুরী, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. অপর্ণা বিশ্বাস, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. সৌমেন সরকার, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. শামসুন্নাহার, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. আফসানা আলমগীর খান, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ মাহবুবুল হাসান, মেডিকেল অফিসার, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ব্যারিস্টার প্রজ্ঞা জামান, সমন্বয়ক, এফডিএমএনএইচআই, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
প্রকৌশলী নওশিবা রহমান, আইটি কনসালটেন্ট, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মোঃ ফাহাদ রহমান, এডমিন এন্ড কো-অর্ডিনেশন অফিসার, এফডিএমএনএইচআই, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
কল্পনা ভান্ডারী, ইন্টার্ন, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
এস এম আলমগীর হোসাইন, প্রোডাকশন টেকনিশিয়ান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মোঃ মাসুদ পারভেজ, এইচএমআইএস কনসালটেন্ট, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ
আবদুর রহিম, থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
সেলিনা চৌধুরী, অফিস সহায়ক, এফডিএমএনএইচআই, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. ফারহানা আক্তার নূর স্বর্ণা, ইন্টার্ন, এফডিএমএনএইচআই, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(উপরের নামের তালিকা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ছবি কৃতজ্ঞতা

ডা. আহমেদুর রহমান সবুজ, মেডিকেল অফিসার (ওএসডি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. রাজীব দে সরকার, রেজিস্ট্রার (সার্জারী বিভাগ), শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

ডা. মোঃ রিজওয়ানুল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ শাহনেওয়াজ পারভেজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. গীতা রানী দেবী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোহাম্মদ রাশিদুল আলম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপিআই ও সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ মারুফুর রহমান অপু, মেডিকেল অফিসার, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ জাহিদ হায়দার, মেডিকেল অফিসার, ইপিআই ও সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মোঃ বজলুর রহমান, উপ-প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ আরাফাতুর রহমান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, প্লানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ
ডা. আবু সাদাত মোঃ সায়েম, হেলথ স্পেশালিস্ট (এমএনএইচ এন্ড এইচএসএস), ইউনিসেফ, বাংলাদেশ

বিশেষায়িত হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল (এনআইসিআরএইচ)
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট (এনআইসিভিডি)
জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (এনআইডিসিএইচ)
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজ এন্ড ইউরোলজি (নিকডু)
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এনআইমিএইচ)
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অফথ্যালমোলজি (এনআইও)
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (নিটোর)
শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা
বার্ন ইউনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল (১০০শয্যা)
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল (এনআইএনএসএইচ)
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল এন্ড ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট
শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, ঢাকা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল, ঢাকা
ঢাকা কুষ্ঠ হাসপাতাল, ঢাকা
ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, ঢাকা
শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (আইসিএমএইচ), মাতুয়াইল
মহামারী, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল (৫০০শয্যা)
মুগদা জেনারেল হাসপাতাল (৫০০ শয্যা)
ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রিভেশন অব রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ, ঢাকা
ন্যাশনাল ইলেক্ট্রোমেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্ট্যানেন্স সেন্টার, ঢাকা
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট)
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ এবং সোশ্যাল মেডিসিন (নিপসম)
বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)
বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)
ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর)
ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা), বিএসএমএমইউ
হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
সকল মেডিকেল কলেজসমূহ ও তাদের ডেন্টাল ইউনিটসমূহ

(উপরের নামের তালিকা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়